ISSN 2278-8026

# অরুণ

নবপর্যায় দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪৩১ ॥ জুলাই ২০২৪

বিভাগীয় পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ॥ কটন বিশ্ববিদ্যালয়

# অরুণ

দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪৩১ ॥ জুলাই ২০২৪

সম্পাদক
**প্রসূন বর্মন**

বিভাগীয় পত্রিকা
বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়

# অরুণ

প্রকাশক
বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটির পক্ষে ড. দেবযানী দে

প্রকাশকাল
শ্রাবণ ১৪৩১ ॥ জুলাই ২০২৪

সম্পাদক
**প্রসূন বর্মন**

সম্পাদনা-পরিষদ
**ড. শিপ্রা গুহ নিয়োগী**
**ড. প্রশান্ত চক্রবর্তী**
**ড. দেবযানী দে**
**ড. মধুপী পুরকায়স্থ**

নামলিপি
**প্রদ্যোত চক্রবর্তী**

প্রচ্ছদ
**নয়নজ্যোতি শর্মা**

মূল্য
**₹ ২৫০.০০**

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
**সিটি অফসেট**
আদাবারী তিনিআলি, গুয়াহাটি ৭৮১ ০১২

ISSN 2278-8026

## উৎসর্গ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(১৮২৪-৭৩)

এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কোনো তথ্য, অভিমত বা মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব।
এজন্য সম্পাদক বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নয়।

# নিবেদন

*অরুণ* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে, ছাত্রদের উদ্যোগে। হাতে লেখা পত্রিকা *অরুণ*-এর নামটিকে গ্রহণ করেই ২০০২ সালে কটন কলেজের বাংলা বিভাগের মুখপত্র প্রকাশিত হয়। মোট সাতটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পত্রিকা *অরুণ*-এর যাত্রা শুরু হল এবার।

এ সংখ্যায় মূলত তরুণ গবেষকেরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সকলেই সচেষ্ট থেকেছেন সাহিত্যের নবতর পাঠ ও বিশ্লেষণে। অনালোকিত-অনালোচিত নানা দিক উঠে এসেছে এই সব আলোচনায়। এই সন্দর্ভগুলির পাশাপাশি প্রকাশিত হল বিশ্বভারতীর মাঘোৎসবে প্রদত্ত আচার্যের অভিভাষণ এবং বিভাগে আয়োজিত আলোচনাসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাব্য-কবিতা নিয়ে সঞ্জয় চক্রবর্তী-প্রদত্ত ভাষণটি।

সহৃদয় পাঠকের মতামত ও পরামর্শ পেলে আমরা উৎসাহিত হব। সকলকে শুভেচ্ছা।

**ARUN**

*A Double-Blind Peer Reviewed Journal of Humanities*

Advisory Board

**Jayanta Bhushan Bhattacharjee**

*(Formerly Vice-Chancellor, Assam University, Silchar)*

**Ramkumar Mukhopadhyay**

*(Litterateur, Formerly Regional Secretary, Eastern Region, Sahitya Akademi)*

**Usharanjan Bhattacharya**

*(Retd. Professor, Gauhati University, Guwahati)*

**Manabendra Mukhopadhyay**

*(Professor, Visva-Bharati University, Santiniketan)*

**Barendu Mandal**

*(Professor, Jadavpur University, Kolkata)*

Editorial Board: 2024-25

Editor
**Prasun Barman**

Members
**Dr. Sipra Guha Neogi**
**Dr. Prasanta Chakraborty**
**Dr. Madhupee Purakaystha**
**Dr. Debjani Dey**

*ARUN Bibhagiya Patrika* [Departmental Journal], Department of Bengali, Cotton University, Guwahati 781 001, Assam

Volume XXII, Issue I ॥ July 2024

www.cottonuniversity.ac.in

# সূচি


| | | |
|---|---|---|
| মাঘোৎসব: আচার্যের অভিভাষণ | মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ৯ |
| বাংলা কবিতা: উত্তরপূর্বের আলোয় | সঞ্জয় চক্রবর্তী | ১৫ |
| মেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা: অধিকার আদায়ের প্রারম্ভিক আখ্যান | জয়িতা দাস | ৩৩ |
| স্বর্ণকুমারী দেবীর দৃষ্টিতে নারী পরিসর | মধুপী পুরকায়স্থ | ৪৬ |
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা: নাটমঞ্চে এক লেখকের জীবনদর্শনের বিবরণ | গোবর্ধন অধিকারী | ৫৪ |
| সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনিতে অপরাধ ও অপরাধী: একটি অধ্যয়ন | রাহুল দে | ৬৭ |
| বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র | দীপশিখা দাস | ৮২ |
| পুরাণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ: বাণী বসুর *অষ্টম গর্ভ* | প্রাণজিৎ সরকার | ৯৭ |
| কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ: বর্ণময় সাংবাদিকের জীবনালেখ্য | অশোককুমার রায় | ১০৯ |
| *সোনার সিঁড়ির উপকথা*:লোককথার খণ্ড চিত্র | তপতী দত্ত ।। প্রসূন বর্মন | ১১৫ |
| লেখক-পরিচিতি | | ১২৪ |

# মাঘোৎসব: আচার্যের অভিভাষণ

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(ব্রাহ্মসমাজ তথা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব 'মাঘোৎসব'। শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দিরে এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনেকবার এই উপাসনায় আচার্যের ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ মাঘ ১৪৩০, ইংরেজি ২৬ জানুয়ারি ২০২৪, শুক্রবার সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে 'মাঘোৎসব'-এর উপাসনায় আচার্যের ভূমিকা পালন করেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আচার্যের সেই অভিভাষণটি তাঁর অনুমতিক্রমে এখানে মুদ্রিত হল।)

'মাঘোৎসব' উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় আমরা আমাদের মন্দিরে সম্মিলিত হয়েছি। ব্রাহ্মসমাজ তথা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের কাছে এই 'মাঘোৎসব'-এর তাৎপর্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দিনটিকে নেহাতই 'ব্রাহ্মোৎসব' না বলে 'ব্রহ্মোৎসব' হিসেবে চিহ্নিত করে গিয়েছেন। এর ফলে দিনটি সম্প্রদায়-বিশেষের পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে এখন সর্বজনীন উৎসবের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখতে পাই, ১২৩৫ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮২৮ খ্রি.) ৬ ভাদ্র রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মসমাজ। কলকাতার ৫১ নম্বর চিৎপুর রোডের কমললোচন বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ। অনতিকাল পরে ১২৩৬ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৩০ খ্রি.) ১১ মাঘ ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডে ব্রাহ্মসমাজের নিজগৃহে প্রবেশ ঘটে। সেই দিনটি 'মাঘোৎসব' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে এতকাল। এই দিনটিকেই রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ তাদের 'সাম্বৎসরিক দিবস' হিসেবে গণ্য করে। মনে হতে পারে, শুধু সমাজের নিজস্ব ভবন-পত্তনের দিনটিকে ব্রাহ্মরা তাঁদের প্রধান

---

**মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** : মাঘোৎসব: আচার্যের অভিভাষণ
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৯-১৪

উদ্‌যাপন-তিথি হিসেবে কেন অঙ্গীকার করলেন ? এর কারণ, দিনটিকে তাঁরা শুধু একটি ভবন-উদ্বোধনের দিন হিসেবে দেখেননি। এই দিনটি ছিল তাঁদের কাছে নতুন একটি ভুবন-প্রতিষ্ঠার সমতুল। অন্তত মহর্ষি তো এইভাবেই 'মাঘোৎসব'কে সমাজের প্রধানতম উৎসবে পরিণত করতে উদ্যোগী হন। মহর্ষির কাছে এই দিনটি ছিল অতি পবিত্র। একবার 'মাঘোৎসব'-এর প্রাক্কালে প্রদত্ত এক অভিভাষণে মহর্ষি বলেছিলেন:

> এই ১১ই মাঘের উৎসব কিসের জন্য? ইহারই জন্য যে এই দিবসে আমরা সকল প্রকার পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলাম।... আমরা ১১ই মাঘ ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

ইতিহাসের তথ্য অনুসারে অবশ্য ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্ম— কোনোটিরই প্রতিষ্ঠা দিবস নয়। তবে মহর্ষির এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, অন্তত তাঁর চেতনায় ১১ মাঘই ছিল ব্রাহ্মধর্মের 'কার্যত' প্রতিষ্ঠা দিবস! এ-জন্যই প্রবাসে-স্ববাসে যখন যেখানে থাকতেন মহর্ষি— 'মাঘোৎসব' নিয়ে থাকত তাঁর বিশেষ ব্যাকুলতা। সে উৎসব-রচনায় সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার প্রতিও ছিল মহর্ষির সতর্ক মনোযোগ। এও বলতে হবে, 'মাঘোৎসব' বস্তুত মহর্ষিরই দান। ১৮৩০ সালে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবন প্রবেশের এই দিনটিকে রামমোহন-অনুরাগীরা সমাজের 'সাম্বৎসরিক'-এর দিন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে মহর্ষির সৌজন্যেই। ব্রাহ্মসমাজের এই ভবন প্রতিষ্ঠার পরই রামমোহন রায় বিলাত যান; এবং সেখানেই তিনবছর বাদে ১৮৩৩ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। রামমোহনের অবর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে। সেই স্তিমিত, রুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করেন দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৩৯ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে রামমোহন-প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর লক্ষ্য ও সংকল্পের অভিন্নতার কারণে ১৮৪২ সালের বৈশাখে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে তাকে মিলিয়ে দেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। পরের বছর ১২৫০ সালের ৭ পৌষ মহর্ষি কুড়িজন সহব্রতীসহ ব্রহ্মের নামে ব্রত-অঙ্গীকার করার পরই ব্রাহ্মসমাজ 'ব্রাহ্মধর্ম'-এর রূপ পরিগ্রহ করে। মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণের যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন তার পঞ্চম নির্দেশিকায় অঙ্গীকার ছিল: "প্রতি বুধবারে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে, এবং প্রতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে... একাকী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।"

এই প্রতিজ্ঞাপত্র থেকে বোঝা যায়, মহর্ষির কাছে এগারোই মাঘের গুরুত্ব কত ব্যাপক ছিল! সাতই পৌষ দিনটি যদি হয় আমাদের কাছে মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের স্মরণ-দিবস, তাহলে এগারোই মাঘ হল তাঁর ব্রহ্মবীক্ষা-মননের উদ্‌যাপন-দিবস। তবে একথা সত্য, 'মাঘোৎসব' অন্তরের গভীরে ব্রহ্ম-উপলব্ধিতে নিবেশিত হওয়ার এক পবিত্র উপলক্ষ্য হলেও বহিরঙ্গ বিচারে ব্রাহ্মসমাজ এবং ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দিনটি আনন্দময় উদ্‌যাপনের লগ্ন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী দেবী লিখেছেন:

> পিতামহের আমলে দুর্গোৎসব যেমন আমাদের বাড়ির সামাজিক আনন্দোৎসব ছিল এবং এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, পিতার ইচ্ছা ছিল মাঘোৎসবকে তিনি সেইরূপ আমাদের বাড়ির অবারিত আনন্দ সম্মিলনের মত করিয়া তুলিবেন।

সৌদামিনী দেবীর পরের প্রজন্ম, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' বইতে লিখেছেন:

> যোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের উৎসবের মধ্যে ছিল ১১ই মাঘ।... সেটা অন্যদের

> দুর্গাপূজার মত।... হিন্দু সাকারবাদীদের পক্ষে নিরাকারে ভগবদুপাসনা লঘুন্মন্য নয়। তাই এ বাড়ির ১১ই মাঘের উপাসনায় যোগ দিতে ও গান শুনতে ও-বাড়ির (গিরীন্দ্রনাথের পরিবারের) সবাই আসতেন— মেয়েরাও।... আমাদের মুখে ও মনে ছিল শুধু একটি কথা— "১১ই মাঘ"। সাধারণ ব্রাহ্ম ও নববিধানীদের কারো ছিল ১০/১৫ দিনব্যাপী, কারো একমাস ব্যাপী ব্রহ্মোৎসব, আমাদের ছিল শুধু একটি দিন, ১১ই মাঘ।... ১১ই মাঘে এক থাম থেকে আর এক থামে গাঁদা ফুলের মালা লম্বা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হত।... দেওয়ালে বেলোয়ারের ঝাড় লাগানো হত।... ৯ই মাঘের দিন বিকেল বেলায় তেতলার ছাদ থেকে উঠোনের উপর শামিয়ানা খাটান হলে সমস্ত বার বাড়িটা অন্ধকারে ছেয়ে যেত। কিন্তু সেই অন্ধকারই আমাদের মনে উৎসবের ভাবকে ঘনিয়ে আনত।... ১১ই মাঘের উৎসব একটি বীজের ক্রমোদ্ভেদ...। ১১ই মাঘের উৎসবটিই উৎসব বলে আমাদের মনে প্রতিভাত হত।... ১১ই মাঘের উৎসব ছিল উপাসনা ও সঙ্গীত প্রধান উৎসব।... বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভ্রাতাদের সহ ১১ই মাঘের সঙ্গীতের আসরে নামলেন তখন ব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয়ের কোণে কোণে যেখানে যত নদী খাল বিল শুকনো ছিল সব ভরে উঠল।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইতে স্বল্পাক্ষরে ঠাকুরবাড়িতে ১১ মাঘ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেছেন। সরলা দেবী বলেছেন, সংগীত-পিপাসু অব্রাহ্মরাও সেই উৎসবে যোগ দিতেন। বাস্তবিকই, এই মাঘোৎসব উপলক্ষেই কত যে ব্রহ্মসংগীত রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাংলা সংগীতের ইতিহাসে মাঘোৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আর সেই সংগীতের সুরধুনীর প্রধান ভগীরথ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। আমাদের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটিও ১৯১২ সালের মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত হিসেবেই গীত হয়েছিল। একসময় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হত জোড়াসাঁকো বাড়ির মাঘোৎসবে গাইবার জন্য। কালের নিয়মে জোড়াসাঁকো বাড়ির 'মাঘোৎসব'-এ কিছুটা প্রথানুবর্তনের কৃত্রিমতা দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ মূলত শান্তিনিকেতনেই মাঘোৎসব-উদ্‌যাপনে বিশেষ মনোনিবেশ করতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ১০ জানুয়ারি ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে কবির এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিক মাঘোৎসব-উদ্‌যাপনেই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা।

## ২

প্রশ্ন হল, এখন আমরা কীভাবে দিনটিকে যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে পারি? এই দিনটিকে আজ আমরা কোন তাৎপর্যে গ্রহণ করব? এ কি নেহাত এক প্রথার অনুবর্তন? এ-কথার উত্তর খুঁজতে চাইলে আমাদের ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। প্রথমে আসা যাক এর ধর্মতত্ত্বগত দিকটির প্রসঙ্গে।

রামমোহন রায় রচিত ন্যাসপত্রে কোনো ধর্ম-প্রবর্তনের উল্লেখ ছিল না। তবে তিনি যেভাবে উপাসনাবিধি রচনা করে গেছেন তাতে বোঝা যায়, ধর্মাচরণের স্বতন্ত্র একটি মার্গের ভাবনা তাঁর ছিল। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাবিধির বনেদের উপরই কার্যত দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মধর্মের। বেদ-উপনিষদ্, মহানির্বাণ তন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে গ্রহণ-বর্জন ও পরিমার্জনার প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত মন্ত্র নিয়ে মহর্ষি রচনা করেন 'ব্রাহ্মধর্ম্মঃ'

নামের সংহিতা। আর ব্রাহ্মদের জন্য আচরণ-সংহিতা রচনা করার সময় মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবতদ্‌গীতা, মনুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ থেকেও তিনি বিচারপূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করেন। 'ব্রহ্ম' শব্দটির মূলে আছে নিরন্তর বিস্তৃতির ব্যঞ্জনা। এই 'ব্রহ্ম' হলেন সর্বব্যাপী। 'ঈশাবাস্যমিদমসর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'— ঈশোপনিষদের এই প্রথম শ্লোকটির মধ্যেই মহর্ষি-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরের অংশে একজন ব্রাহ্মের আচরণতত্ত্বের সারকথা নিহিত আছে। 'জগতের সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন'— এই হল এই শ্লোকের প্রথমাংশের মর্মার্থ। ব্রহ্ম শুধু মানুষের পাপপুণ্যের বিচারকের আসনে সমাসীন নন। এই জগতের যা-কিছু, এবং তদতিরিক্ত যা-কিছু; সবের মধ্যে কেবল তাঁরই অভিব্যক্তি। কোনো কিছুই তাঁর বাইরে বলে কল্পনা করা যায় না। তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা ছাড়া ব্রাহ্মধর্মের আর কোনো আকাঙক্ষা বা মোক্ষচিন্তা নেই। তাঁকে উপলব্ধি করার এষণা থেকেই তাঁর সমীপে আমাদের এই আসন পাতা। সেইজন্য ব্রাহ্মধর্মের সাধন-পদ্ধতির নাম হল 'উপাসনা'। বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্মাদি পরিত্যক্ত হয়েছে মহর্ষির ধর্মপ্রকল্পে। আবার যেহেতু তাঁর 'ব্রহ্ম' সর্বব্যাপী, তাই তাঁর কোনো প্রাকৃত মূর্তিকল্পনাও অসিদ্ধ। মাধ্যস্থ হিসেবে কোনো মূর্তি বা প্রতীক কল্পনা তাঁর স্বরূপের মহিমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলেই ব্রাহ্মধর্ম অপৌত্তলিক। তবে মহর্ষির 'ব্রহ্ম' নির্গুণ ব্রহ্ম নন। বস্তুত, ব্রাহ্মধর্ম একেশ্বরবাদী হলেও দ্বৈতবাদী। কেননা, ভক্ত এবং ব্রহ্ম— দুই-ই ব্রাহ্মধর্মে স্বীকৃত। শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈতবেদান্তবাদ' মহর্ষি গ্রহণ করেননি। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মভক্তি— উভয়ই গুরুত্ব পেয়েছে ব্রাহ্মধর্মে। বলা যায়, এ-ও একরকম 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'। আর ৰ্আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়' হল চিত্তে ব্রহ্ম-উপলব্ধির শর্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি তখনই হতে পারে, যখন ভক্তের চিত্ত হয়ে ওঠে 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ' ও 'বিশুদ্ধ'। একটি দৃষ্টান্ত নিলে ব্রাহ্মধর্মের জ্ঞানতত্ত্ব বা এই এপিস্টেমোলজিটি বুঝতে সুবিধা হয়। যখন চরাচর অন্ধকার থাকে তখন কোনো বস্তুকে দেখবার জন্য লাগে বাইরের আলো। কিন্তু যখন সূর্যোদয় হয়, বস্তু প্রত্যক্ষণের জন্য তখন বাইরের আলোর প্রয়োজন হয় না। তেমনই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত হতে হয় উপাসকের হৃদয়। আর তা সম্ভব, যদি সে হৃদয় হয় 'বিশুদ্ধ'। চিত্তের এই বিশুদ্ধির একটি উপায় নির্দেশিত আছে ঈশোপনিষদের ওই প্রথম মন্ত্রের পরের অংশে। 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'। অন্যের স্বত্বে নির্লোভ থাকা, এবং ত্যাগদীপ্ত নিরাসক্ত ভোগসাধন হল ব্রহ্ম-অভিলাষীর জীবনের কার্যকর শর্ত।

মহর্ষির ব্রহ্ম 'সগুণ'। তাঁর মন্ত্রসংহিতার 'সমাধানম্' অংশে তিনি ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ; এবং শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম/ আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি/ শান্তং শিবমদ্বৈতম্'। বেদ-উপনিষদ্ মন্থন করে মহর্ষি এই মন্ত্রটি মনের মতো করে গেঁথে নিয়েছিলেন। ব্রহ্মের এই অসীম গুণাবলির মধ্য থেকে আমরাও আপাতত বেছে নিতে পারি তাঁর তিনটি গুণ: তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ; অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। 'সৎ' কথাটির অর্থ এখানে অনেস্ট নয়। এখানে অর্থ 'তিনি আছেন', তিনি 'অস্তিত্বশীল'। কেন তাঁকে 'সৎ' বলে মানব? কারণ, তা না মানলে, এই যে আমরা 'আছি' বলি, সেই বলাটাও অলীক হয়ে যায়। পশ্চিমের কোনো কোনো দর্শনেও বলা হয়েছে, যদি আমি সবকিছু অস্বীকার করিও, তবু আমি যে 'আছি' তা অস্বীকার করা যায় না। রেনে দেকার্ত যে বলেছিলেন, 'কগিটো আরগো সাম'; 'আই থিংক দেওয়ারফোর আই অ্যাম'— মহর্ষির 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থটিতেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। এই 'আমি'-র থাকাকে অন্তত মানতে হয়, কেননা, সংশয় প্রকাশকারী কর্তাটিকে অন্তত স্বীকার না করে উপায় নেই। মহর্ষি মনে করেন, এই অস্তিত্ব সম্ভব হয়, কারণ সর্বব্যাপী একটি অস্তিত্বের মূলাধারেই সবকিছু

ব্যাপ্য হয়ে আছে। এর বিপরীত কথা অলীক। কিন্তু তিনি 'চিৎ' বা চেতনস্বরূপ বলে কেন মানব? কারণ একইভাবে তা না মানলে তাঁর থেকে জাত এই আমাদের অস্তিত্বকেও অচিৎ-অচেতন বলে ধরে নিতে হয়! আর তিনি আনন্দস্বরূপ কেন? কারণ, তাঁর কথা স্মরণ হলে হৃদয়ে আনন্দের পরিপ্লাবন হয়। যদি তিনি স্বরূপত আনন্দঘন না হতেন তা হলে এই আনন্দের বান আসে কোথা থেকে?

কেউ অবশ্য বলতে পারেন, সবকিছুর মূলে এরকম একটি পরমসত্তাকে মানতেই হবে কেন? মহর্ষি বলবেন, এই জগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার মধ্যে একটি নিয়মের রাজত্ব ক্রিয়াশীল রয়েছে। এই নিয়মের নেপথ্যে একজন নিয়ামককে কাজে-কাজেই অনুমান করা যায়। লা-মেট্রির দর্শনের মতো এই নিয়ামক কোনো জড়শক্তি কিংবা নিতান্ত প্রকৃতিপরতন্ত্র হতে পারে না। কেননা প্রকৃতিও একটি নিয়মতন্ত্রের অধীন। তবে প্রকৃতিও জড়মাত্র নয়। যে-উৎস থেকে সবকিছু এসেছে তা চৈতন্যসত্তাজাত। কেননা, তা নাহলে আমাদের এই প্রাণময়, চেতনাময় অস্তিত্বও 'জড়' বলে সাব্যস্ত হয়! তা যে নয় তার প্রমাণ তো আমরা নিজেরাই! এই জগৎটা শঙ্করাচার্য-কথিত 'মায়া'-ও নয়। এই জগতের মধ্য দিয়ে সেই আদিশক্তির অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে বলেই জগৎটা 'মায়া' নয়। এখন মানুষের কর্তব্য হল, সেই সর্বসত্ত্ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। প্রকৃতির দিকে তাকালে আমরা উপলব্ধি করি, একটি সুষম ছন্দোময়তা রয়েছে এই জগতের মধ্যে। উপনিষদ্ নানাভাবে এই ছন্দকে তার মন্ত্রগুলিতে ব্যক্ত করেছে। বস্তুত এই ছন্দোময়তার যে স্থিতিভাব, তারই অপর নাম 'শান্তি'। তাতেই সাধিত হয় 'শিব' বা 'মঙ্গল'। আবার এই ছন্দোময়তাকে সম্যক জ্ঞানে উপলব্ধির নাম 'সত্য'। আর সেই ছন্দোময়তাকে অন্তরে উপলব্ধির সংবেদনা হল 'আনন্দ'।

মহর্ষি মনে করেছিলেন, এই ব্রহ্মকে স্মরণ-মননের প্রযত্নই হল ধর্ম। ব্রহ্মের কাছে তদতিরিক্ত আর কোনো প্রার্থনা থাকতে পারে না মানুষের। এবং সংসার-জীবনে থেকেই এই স্মরণ-মনন সম্ভব। মহর্ষি বেদ-পরিত্যাগ করে গৃহস্থ বেদ-সন্ন্যাসের পন্থার কথাই বলেছিলেন। সংসার-ত্যাগের বৈরাগ্য বা ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞের কথা বলেননি।

হিন্দুধর্ম-দর্শনের মধ্যে লক্ষ করা যায়, যুগের উপযোগী করে তোলবার তাগিদে বারবার ধর্মের প্রস্থানভেদ ঘটেছে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিপরীতে এইভাবেই গড়ে উঠেছে রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রমুখের নানাধরনের দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী মত বা প্রস্থান। খেয়াল করলে দেখব, উনিশ শতকেও ব্রাহ্মসমাজের মতো বেদ-উপনিষদভিত্তিক একেশ্বরবাদী আরও কতকগুলি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষে। এরমধ্যে আছে আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, শ্রীধরলু নায়ডুর বেদসমাজ ইত্যাদি। ইতিহাসের দিক থেকে এই বিষয়টির তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যাবে, হিন্দুসমাজে যখন আচারসর্বস্বতা ও সংকীর্ণতা ব্যাপক হয়ে তার প্রাণধারাকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনই 'একেশ্বরবাদী' ধারাগুলির ঐতিহাসিক উদ্ভব ঘটেছে। বহুধাবিচ্ছিন্ন জাতিকে একটি ঐক্যের অভিমুখে চালিত করার তাগিদ থেকেই সম্ভবত এটা ঘটে থাকবে। শঙ্করাচার্যও আবির্ভূত হয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপের যুগে হিন্দুধর্মের গ্লানিময় একটি পর্বে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক পটভূমিতে রাজা রামমোহন রায় আচারদীর্ণ, পৌরাণিক জটাজালে আকীর্ণ ভারতবাসীকে একটি একেশ্বরবাদী চেতনার দিশা দিতে চেয়েছিলেন। তবে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর ধর্মীয় লক্ষ্য ছিল বিশ্বজনীনতার অভিমুখে। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ সালে। আর ১৮২৯ সালেই তিনি রচনা করেন, 'দ্য ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন' নামের একটি কথোপকথনমূলক নিবন্ধ। এর থেকে বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজে যে 'ব্রহ্ম'-এর উপাসনার কথা তিনি ভেবেছিলেন, তার মূলে ছিল একটি বিশ্বজনীন ধর্মের অভীপ্সা। বেদ-উপনিষদকে তিনি বিশ্বজনীন মনে করেই তার উপর

প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নবযুগের ধর্ম। ১৮১৫ সালে তিনি যখন মহর্ষি বাদরায়ণের (ব্যাসদেব) 'ব্রহ্মসূত্র'-এর শাঙ্করভাষ্য বাংলায় অনুবাদের কাজে হাত দেন, লক্ষণীয়, সেই সময়েই একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনহেতু তিনি 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন; যা আসলে ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাভাস। আবার ১৮২১ সালে বন্ধুবর উইলিয়ম অ্যাডামের 'ইউনিটারিয়ান সভা'র সঙ্গে তাঁর সংস্রব গড়ে ওঠে। ইউনিটারিয়ান সংগঠনটিকে বলা যায়, খ্রিস্টীয় একেশ্বরবাদী মতাবলম্বী; যা খ্রিস্টধর্মের 'ট্রিনিটি' বা 'ত্রিত্ববাদ'কে স্বীকার করত না। সেই সভাতে ইংরেজি ভাষায় উপাসনা হত। রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রকান্ত দেব তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। তাঁরাই রামমোহনকে বলেন, একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠার প্রভূত উপকরণ যখন ভারতীয় শাস্ত্রেই রয়েছে, তখন ইউনিটারিয়ান সভায় না গিয়ে দেশী মতে একটি সভা স্থাপন করাই সমীচীন হবে। ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তির এই হল অন্যতম নেপথ্য কারণ।

কিন্তু কীভাবে একেশ্বরবাদ জাতির কিংবা মানবজাতির সংহতি বিধানে ভূমিকা নেবে? শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন:

> তিনি [রামমোহন] এরূপ ধর্মের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন যাহা সমগ্র জগতের সমুদয় মানবসমাজকে একসূত্রে বাঁধিবে। এই সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক ধর্মের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে বাস করিত। তিনি যখনই কোনো ধর্মের ক্রিয়া দেখিতেন তখনই এই আধ্যাত্মিক মহাধর্মের ভাব তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইত।... তিনি বলিতেন, Ours is Universal Religion।

রামমোহনের একান্ত অনুরাগী, যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্তও বলেছিলেন: "অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।... সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোনও ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।" একালে রামমোহন-গবেষক দিলীপকুমার বিশ্বাসও বলেছেন, "রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদ-প্রোক্ত ব্রহ্মবাদকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করে তার প্রভাবে জাতির পুনর্জীবন ও পুনর্গঠন সাধন।"

ব্রাহ্মসমাজ সেই কাজ কতদূর করতে সমর্থ হয়েছে তা নিশ্চয়ই তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু আজ এই উৎসবের দিনে ব্রাহ্মধর্মের এই তত্ত্ব ও ইতিহাস আমাদের নতুন করে অনুধাবন করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগেই 'নবযুগের উৎসব' শিরোনামের মন্দির-ভাষণে বলেছিলেন:

> আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে-কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না। আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।... আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমনকি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোটো করা হবে। আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব।... আমাদের এই উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব; আমাদের প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

আমরাও সংকল্প নিই, যাবতীয় সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি দূর করে 'বহুর মধ্যে এক' এবং 'একের মধ্যে বহু'কে সমন্বিত স্বরূপে উপলব্ধি করে এই উৎসবকে যথার্থ সর্বজনীন 'উৎসব' করে তুলি।

# বাংলা কবিতা: উত্তরপূর্বের আলোয়

সঞ্জয় চক্রবর্তী

(গত ২৪ মে, শুক্রবার কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল ‘উত্তরপূর্ব ভারত: বাংলা গল্প ও কবিতার আলোয়’ শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেছিলেন উত্তরপূর্ব ভারতের কবি ও কবিতা নিয়ে। সে ভাষণটির লিখিত রূপ বিভাগীয় পত্রিকা ‘অরুণ’-এ প্রকাশিত হল।)

প্রথমে দুটি কবিতা দিয়ে শুরু করা যাক।

“লাল বাতির নিষেধ ছিল না
তবুও ঝড়ের বেগে ধাবমান কলকাতা শহর,
অতর্কিতে থেমে গেল।”

“সামান্য সে-জনপদ। শ্যামল পর্বতে ঘেরা। ছোট
নদী। কেউ-বা-সিলেটি, কেউ অসমিয়া, হিন্দিভাষী, ডিমাছা, নেপালি কিংবা আর কেউ।
বন্দরে খালাসি যথা, ভিন্ন বুলি, ভিন্ন চাল, একত্রে বাজারে মেশে, চা দোকানে।
পচা বান খেতে খেতে মিষ্টির দোকানে বসে শুনি কতরূপ ভাষা, লাগে ঢেউ অকস্মাৎ মর্মদেশে,
ওই যে কাছাড়ি নার্স, হিন্দুস্তানি ড্রাইভার, সিলেটি মাস্টার সবাইকে মনে মনে চুরি করি, উহাদের ছাড়ি না আমি, প্রত্যেকে আমার।”

**সঞ্জয় চক্রবর্তী:** বাংলা কবিতা: উত্তরপূর্বের আলোয়
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৫-৩২

প্রথম কবিতাংশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা, 'কলকাতার যিশু' ও দ্বিতীয় কবিতাটি দেবাশিস তরফদারের কবিতা থেকে নেওয়া। প্রথমটি কলকাতা শহরে বসে লেখা। এই কবিতাটি উত্তরপূর্বের যে কোনো কবিও লিখতে পারতেন। কিন্তু আমাদের এক কবি লিখলেন, দ্বিতীয় এই কবিতাটি। কারণ, এটাই আমাদের বাঙালিয়ানা, এটাই আমাদের বসবাস, যাপন, পারিপার্শ্বিকতা। আমাদের বাস্তব। এবার একটু ফিরে দেখা যাক।

চর্যাপদ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা কবিতা ছিল গেয়-সাহিত্য। অর্থাৎ, গান গাওয়ার জন্য যে-পদ রচনা হত, সে-ই ছিল কবিতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হয়ে আধুনিক সময় তখন এসে পড়ল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলা কবিতায় নিয়ে এলেন আধুনিকতা, যা, আজও গৌরবে বহমান।

উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতার পুরো ভূমি, পটভূমি, বৃহৎ। স্বল্প সময় পরিসরে এই বিস্তৃত কাব্যভুবনে কতটা আলোকসম্পাত করা যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমার নিজেরই সংশয়।

কয়েকটি ভূখণ্ডে বাংলা কবিতা এই অঞ্চলে লালিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য, অসমের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর।

## দুই

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ পর্বে, মণিপুরে বিজয় পাঞ্চালির 'রাজন্যচরিত' কাব্য পাওয়া যায়।

নাগাল্যান্ডের মোককচঙ শহরে গত শতাব্দীর সত্তর দশকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা, 'সীমান্ত'। এবং দু'হাজার সালের প্রথমার্ধে, 'পূর্বাদ্রি', 'মনন' পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলো ঘিরেই বিকশিত হয় বাংলা সাহিত্য।

গারো পাহাড়ে, গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে উন্নত পর্যায়ে বাংলা কবিতা চর্চা হয়েছে। কমল সাহা, বিশ্বজিৎ নন্দী এবং হেলালুজ্জামান সম্পাদিত, 'গারো পাহাড়ের কবিতা' সংকলনে চোদ্দোজন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে।

মেঘালয়ের শিলং শহরে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে ষাট দশক পর্যন্ত একটা জোয়ার এসেছিল। প্রকাশিত হয়েছে, 'সংঘাত', 'মুরজ', 'প্রথম পরিচয়', সাইক্লোস্টাইলে 'উৎস'। এর অন্যতম কবি ছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। রমানাথ ভট্টাচার্যের 'ঋতুরঙ্গ', পীযূষ ধরের, 'পাহাড়িয়া'। সুকুমার বাগচী, সৌমেন সেন, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মৃণাল বসু চৌধুরী মিলে প্রকাশ করেছিলেন, 'দেশান্তর'। শঙ্কর চক্রবর্তীর 'শতাব্দী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'উমিয়াম'। এই সংস্থার 'কর্মশালা' পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই পত্রিকাগুলো ঘিরেই মেঘালয়ে বাংলা কবিতার চর্চা হয়ে আসছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা সুদীর্ঘকাল থেকে বাংলাভাষা। ত্রিপুরার রাজা ধর্মমানিক্যের (১৪৩১-৬১) আদেশে, রাজপরিবারের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ, 'রাজমালা', বাংলাভাষায় অনূদিত কিংবা লিখিত হয়েছিল। এর প্রথম দুটি লহর, তাঁর সময়কালে লেখা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাপ্ত হয়। এই আখ্যানকাব্যকে প্রাচীন বাংলা কাব্যের নিদর্শন বলা যায়। এক হিসেবে এই গ্রন্থ, চৈতন্য চরিতামৃত এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের থেকেও প্রাচীন। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেই উত্তরপূর্বে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কবি বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর। এ ছাড়া, মধ্যযুগের ত্রিপুরায় গাজীনামা, চম্পকবিজয়, শ্রেণীমালা, কৃষ্ণমালা ইত্যাদি রাজসভাশ্রিত কাব্য রচিত হয়েছিল।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের (১৮৬২-৯৬) শাসনকালে সবদিকেই আধুনিকতার সূচনা হয়। তিনি নিজে

ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্য প্রেমিক। বৈষ্ণবীয় ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে একাধিক বিরহ-মিলনের কাব্য রচনা করেছিলেন। 'প্রেম মরীচিকা,' 'অকাল কুসুম', 'শ্রীশ্রী ঝুলধগীতি' ইত্যাদি। তাঁর সুযোগ্য কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, পিতার অনুপ্রেরণায় তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা,' শোকগাথা,' এবং 'প্রীতি'তে নিজের প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন।

১৯৪৯ সালে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। এদিকে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল বাঙালিরা স্বদেশ ছেড়ে ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নেন। বদলে যায় ত্রিপুরার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হয়, ত্রিপুরার কবিদের প্রথম কবিতা সংকলন, 'প্রান্তিক'।

সাতের দশক থেকে ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় জোয়ার আসে। প্রকাশিত হতে থাকে কবিদের নিজের বই ও সংকলন। রণেন্দ্রনাথ দেব, বিমলকৃষ্ণ চৌধুরী, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, শঙ্খপল্লব আদিত্য থেকে আজকের চিরশ্রী দেবনাথ, সুমন পাটারি, পায়েল দেব, আম্রপালি দে-রা হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে লিখে চলেছেন বাংলা কবিতা।

প্রথমবারের মতো বাংলা সাহিত্যে, সাহিত্য অকাদেমির যুব পুরস্কার এল, উত্তরপূর্বে। সম্মানিত হলেন ত্রিপুরার যুব কবি, সুমন পাটারি। রাজেশচন্দ্র দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করে চলেছেন, 'দৈনিক বজ্রকণ্ঠ' নামে দৈনিক কবিতা পত্রিকা।

হেড়ম্ব রাজ্যের রাজারা গান লিখতেন। সেই রাজসভার কবি, ভুবনেশ্বর বাচস্পতি, বৃহন্নারদীয় পুরাণ বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ কর্মটির নাম, 'শ্রীনারদি রসামৃত'। সময়কাল, ১৭০৮-২০। সেইসময় একই সঙ্গে জনসভার কবিরাও কাব্যচর্চা করতেন। ভবানী দাস, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ গঙ্গারাম প্রমুখ। সঞ্জয়ের মহাভারত লেখা হয়েছিল তখন, যা কাশীরাম দাসের মহাভারতেরও পূর্বের। পরবর্তীতে যে কবিদের পাওয়া যাচ্ছে, তারা হলেন, কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ, গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ, চন্দ্রমোহন বর্মন প্রমুখ।

তবে বরাকের আধুনিক কাব্যচর্চার সূচনা হয়, রামকুমার নন্দী মজুমদারের হাত ধরে। 'মালিনীর উপাখ্যান' গদ্য-আখ্যানটি তাঁর হিরণ্ময় সৃষ্টি। একদিকে তিনি রচনা করেছেন পাঁচালি, যাত্রাপালা, কবিগান, অন্যদিকে লিখেছেন, 'উযোদ্বাহ কাব্য', 'নবপত্রিকা কাব্য', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর উত্তরে লিখেছেন, 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য'।

গত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষার্ধ থেকে বরাক উপত্যকায় পত্র-পত্রিকার জোয়ার এসেছিল। অনেক নতুন কবি, নতুন কবিতা। ১৯৫৭ সালে করুণাসিন্ধু দে ও ত্রিদিব মালাকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'স্বপ্নিল' কবিতা পত্রিকা। এই পত্রিকাকে সমগ্র অসমের প্রথম আধুনিক কাব্য-বিষয়ক পত্রিকা বলে মেনে নেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৬৩-তে, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'অরণ্যপুষ্প' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয় কবিতা সংকলন 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে', যার দ্বিতীয় সংস্করণ যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, ১৯৮৭ সালে। ১৯৬৪-তে প্রকাশিত হয় হাইলাকান্দি থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকা, যা আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান। যদিও সম্পাদক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য প্রয়াত। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশক, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, আজ এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত। কবিতা আলোচনার অভাববোধ থেকেই এই পত্রিকার প্রকাশ।

দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী, অশোকবিজয় রাহা, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, করুণাসিন্ধু দে

থেকে আজকের সুতপা চক্রবর্তী, প্রজ্ঞা পারমিতা, দেববপ্রতিম দেব-রা বরাকের বাংলা কবিতার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা হয় ১৯৫৫ সালে অমলেন্দু গুহ-র 'লুইত পারের গাথা' কাব্যগ্রন্থের হাত ধরে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'সীমান্তপ্রহরী' আগে লেখা হলেও ছাপা হয়েছিল 'লুইত পারের গাথা'র পরে, ১৯৬১ সালে। বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় স্থানান্তর ঘটেছে অনেক। সে-বিষয়ে পরে আসছি, আপাতত, শিলং থেকে গুয়াহাটি শহরের চলে এসেছেন, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সুকুমার বাগচী, রমানাথ ভট্টাচার্য।

ডিব্রুগড় থেকে ঊর্ধ্বেন্দু দাশ ও ক্ষিতীশ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবর্ত' পত্রিকা। যোরহাট থেকে ঊর্ধ্বেন্দু দাশের সম্পাদনায় 'মজলিশ' বেরোয়। ১৯৮৩ সালে কুমার অজিত দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের কবিতার একটি সুসম্পাদিত সংকলন। এবং ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রসূন বর্মন, প্রবুদ্ধসুন্দর কর ও অমিতাভ দেব চৌধুরীর সম্পাদনায় 'উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা'। অনঙ্গমোহিনী দেবী থেকে চিন্ময়কুমার দাস পর্যন্ত মোট ৭৮ জন কবির একাধিক কবিতার সংকলন। অমলেন্দু গুহ, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, রবীন্দ্র সরকার থেকে শুরু করে আজকের শ্রাবন্তী দাস পুরকায়স্থ, কমলিকা মজুমদার, অর্জুন দাস, বিমলেন্দু ভৌমিক, নীলদীপ চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দেবলীনা সেনগুপ্ত, জয়া ঘটক প্রমুখের হাত ধরে নিরন্তর কবিতা চর্চা হয়ে আসছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়।

উত্তরপূর্বের বাংলা সাহিত্য মূলত লিটল ম্যাগাজিন নির্ভর। এবং বাংলা কবিতাও। কয়েকটি সংবাদপত্র যদিও সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পৃষ্ঠা খরচ করেন, এখানকার সাহিত্যকে লালন করে আসছে আবহমানকাল ধরে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন এবং তাদের সম্পাদকেরা।

বাংলা কবিতার যে-কয়টি কাব্য-আন্দোলন উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে একটি, 'অতন্দ্র' কাব্য-আন্দোলন। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, 'অতন্দ্র' কবিতা পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে, শিলচরে, ১৯৬৩-তে। সম্পাদক ছিলেন, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, উদয়ন ঘোষ। কবি সুধীর সেন ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য এই বলে 'অতন্দ্র'-এর পরিচয় দিয়েছিলেন, 'শুধু কবিতার জন্য এই পত্রিকার জন্ম'— মন্ত্রের মতো এই প্রত্যয় বুকে নিয়ে 'অতন্দ্র'-এর আবির্ভাব। বছর পাঁচেক পরে 'অতন্দ্র'-এর কবিরাই মিলে গেলেন 'সাহিত্য' পত্রিকায়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮, এই পাঁচ বছরে অন্তত একশোজন কবিকে 'অতন্দ্র'-এ দেখা গেছে।

আরেক কবি, যিনি পরবর্তীকালে বহু আলোচিত, তিনি হাংরি জেনারেশনের অন্যতম প্রদীপ চৌধুরী। ১৯৭০ সালের শেষার্ধে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হল একটি পত্রিকা, 'পাঁক ঘেঁটে পাতালে'। পরে নাম হল, 'রেণেসাঁ।' এই পত্রিকার নামেই হাংরি জেনারেশনের চরিত্র লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, হাংরি আন্দোলন এই উত্তরপূর্বে কিঞ্চিৎ হলেও তার জায়গা করে নিয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তড়িৎ চৌধুরী, বাহারউদ্দিন, এবং উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় অনেক অবাঙালি কবিদের উপস্থিতি। এক অর্থে বীরচন্দ্রমাণিক্য, অনঙ্গমোহিনী দেবীকে এভাবে দেখা যায়। এ ছাড়া করবী দেববর্মন, নন্দকুমার দেববর্মা, চন্দ্রকান্ত মুড়া সিং প্রমুখ। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা থেকে সমরজিৎ সিনহা। বরাকের ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ। নেপালি থেকে ভক্ত সিং, পঞ্জাবি ভাষা থেকে অনিতা দাস ট্যান্ডন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, বাংলা কবিতার পাশাপাশি অসমিয়া কবিতাও লিখেছেন, এই ধারায় উল্লেখ করতে

হয়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অমলেন্দু গুহ, রবীন্দ্র সরকারের নাম। অসমিয়া ভাষায় কবিতা রচনার জন্য রবীন্দ্র সরকার পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এই ধারায় এখন কবিতা লিখছেন, অর্জুন দাস। আমরা নাম করতে পারি, সনন্ত তাঁতির ও সমীর তাঁতির। তাঁরা মূলত অসমিয়া কবিতাই লিখেছেন। আমরা নাম করতে পারি, কিশোর ভট্টাচার্যের। তিনি বাঙালি হয়েও অসমিয়াতে বেশি লিখেছেন। নাম করতে পারি বিপুলকুমার দত্তের, যিনি অসমিয়া ও বাংলা উভয় ভাষাতেই কবিতা লেখেন।

কবিদের স্থানান্তরিত হওয়াও এই অঞ্চলের একটা দিক লক্ষণ। অনেক কবিরা উত্তরপূর্ব থেকে বাইরে গিয়েও কবিতার প্রতি নিবিষ্ট থেকেছেন। অশোকবিজয় রাহা, প্রদীপ চৌধুরী, রণজিৎ দাশ, মনোতোষ চক্রবর্তী, সমরজিৎ সিনহা, দেবাশিস তরফদার, সুব্রতকুমার রায়, তপন রায়, সপ্তর্ষি বিশ্বাস, চিন্ময়কুমার দাস প্রমুখ। আবার জীবিকা সূত্রে উত্তরপূর্বের বাইরে থেকে এখানে এসে তাঁদের কাব্যভুবনে সমর্পিত। বিকাশ সরকার, সমর দেব, অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কলকাতার প্রখ্যাত কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছেন এই অঞ্চলের দুজন কবি। শান্তনু ঘোষ ও স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য।

এমনকী দুজন কবির আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। শিলচরে রামকুমার নন্দী মজুমদার ও কৈলাশহরে হিমাদ্রি দেবের।

পূর্ববঙ্গের বাস্তুচ্যুত ছিন্নমূল বাঙালিরা নিজের দেশ ছেড়ে এই উত্তরপূর্বে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এই অঞ্চলের বাঙালির একটা বড়ো অংশ উদ্‌বাস্তু। অপর ভূমিতে নিজের দেশের অন্বেষণ, এই অঞ্চলের বাংলা কবিতায় দেখা যায়, অস্তিত্বের সংকট, প্রতিবেশী-চেতনা, ভূগোল-চেতনা, এক অন্য বাঙালিয়ানার। কবিতার এই অনন্য উচ্চারণই আসলে উত্তরপূর্বের স্বীয় স্বর।

## তিন

ন্যূনতম একশোজন কবির প্রত্যেকের একটি কবিতার অংশ নিয়েও আলোচনা এই সময় পরিধিতে সম্ভব নয় মেনেই স্বীয় স্বরের রূপটি কেমন, দেখা কি যায়? একটু চেষ্টা করা যাক।

পাশ ঘেঁষে নেমে গেল
বহুদূর মেঘের মিছিল।
হাফলং হিল।

চুলগুলো মুঠোয় নিয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকি
অনুভব করতে চাই তরুণী নাগা-রানির বুকের স্পন্দন।

তোমার দিগন্তের আকাশে জল-ডম্বরু পাহাড়
মেঘের তম্বুরার মতো

চেরাপুঞ্জি থেকে ভায়া শিলং
অবিশ্বাস্য আঁচলের খুঁটে
পাঠাও যে মেঘ,
তাঁর পাঁচ হাজার ফুট নিচে— জল
পড়ে আছে বাংলাভাষায়

মোহিনী বরাককণ্ঠী ষোড়শীর বেশে
দেশে দেশে খুঁজছে আমাকে।

ডোরাকাটা শাড়ি তার শরীরে পেঁচানো
সাপের মতন,
যেন সে পেরিয়ে এল ত্রিপুরার পাহাড়িয়া বন।

স্বপ্ন ছিল জাম্পুই পাহাড়ে গিয়ে শীতের
বাগানে কমলালেবু তুলতে যাব হলুদ বিকেলে

স্বদেশ ছেড়েছি বহুদিন
তবু সাতরঙা গৃহ-কাতরতা দেখা দেয়
ভূমিষ্ঠ হবার লগ্নে

হারাংগাজাও-এর পাহাড়ি রেল স্টেশনে
অস্পষ্ট আলোয় নীল ইউনিফর্ম পরা একটা লোক
অপসৃয়মান রেলগাড়ির কাছে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ হাস্যোজ্জ্বল মিজো তরুণীরা
রঙিন পোশাকে ঝলমল-বার্মিজ ছাতাটি মেলে
নেমে আসুক না আমাদের শান্ত সমতলে, আজ
সমস্ত বৈরি সাজ ত্যাগ করে মিত্র হাত প্রসারিত করো।

বাবার নিস্তব্ধ মুখে ফুটে আছে বাবার জীবন
দেশভাগের নিঃস্ব এক উদ্বাস্তুর ভূমণ্ডল যাত্রা, অভ্যুদয়।

ও নাগা পাহাড়ের মেয়ে। ভারতীয় চুড়িদারের

নতুন সুযোগগুলো
তোর কুশলী শরীর টের পায় কি?

অনেক আগে গত হয়েছেন বাবা
উনি জানেননি এনআরসি মহিমা
পৈত্রিক সম্পত্তি জমি-জিরাতবাড়ি-ঘর নয়
শুধু সাত রাজার ধন এক টুকরো কাগজের
লিগ্যাসি ডাটা!

রিফিউজি লতার ঝোপে ঢাকা পড়ে গেল আহা
ঢাকাই লুঙ্গির চেয়ে প্রিয় ভালোবাসা
নিরুপম অন্ধকারে আমি ও সুশীলা নিঃস্ব পুঁটলি প্যাটারা
হাতে দাঁড়ালাম শিমূল পতাকা বুকে
বিজন স্টেশনে

যারা রাতের গভীরে কখনও
আলপথ পেরোয়নি, তারা বাঙালি নয়।

তীর্থজয় লিয়াং, কবে আর কার ধান মেপে দেবে তুমি
রোজ রাতে অলৌকিক জুমের আগুন
নদীর রেলিং-এ এসে থেমে যাবে।

আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য
চিরকাল বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকব। যেমন দেশের বাড়িতে
নৌকোর জন্য প্রতীক্ষমান মা ও আমি, আমি ও
ছোট ভাই নদীতীরে

বিহুরানি হয়েছিল বৈজয়ন্তী
যার পিতা এক প্রব্রজিত পুরুষ
যার ধমনীতে প্রজ্জ্বলিত পদ্মা-মেঘনার আদর।

আমার নিজের দেশ আমার শরীরে থাকে।
যে দেশ তোমায় তার ইতিহাসে
পাদটিকা করে

আমাকে অদৃশ্য করে দিতে চাও
মানচিত্র থেকে?

আমার নিজের কোনও দেশ নেই।

হোজাই পেরিয়ে তারপর একবার ডংকা মোকামের
দিকে যাই
বাসের ভিতর বসে বিহুগান গেয়েছিল ভ্যালেরির বউ
উমলিনে গারোবালিকার পিঠে ছিল কার জানি
নখের আঁচড়
নেলির পথে বসে আমরাও কম তো দেখিনি
বলো নরসংহার

এপারে আগিয়াঠুরি, ওপারে জালুকবাড়ি শীর্ষে
নীল মা-কামাখ্যাধাম।
নমো কর। ফেলো মুদ্রা লোহিতের জলে। দক্ষিণে
হিড়িম্বার বাড়ি।

দখনায় সবুজের বাড়াবাড়ি ভিড়
একরাশ পশুদের অনর্গল খিদে
তাঁতশালে সাংসুমৈ একা একা
কী স্বপ্ন বুনেছিলে তুমি!

হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড

আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে যখন
বললাম,
করিমগঞ্জ, আসাম
বাংলাভাষার পঞ্চদশ শহীদের ভূমিতে আমার
বাস।
তিনি তখন একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে
ভিরমি

খাইয়ে দিয়ে বললেন,
ও ! বাংলাদেশ ? তা-ই বলুন।

উল্লিখিত কবিতার পঙ্‌ক্তি থেকেই বোঝা যায়, কীভাবে নানা চেতনায় উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতায় একটি স্বীয় স্বর গড়ে উঠেছে। এই শেষ নয়, আরও আছে। বাংলা কবিতায় কীভাবে ধাত্রী ভাষা অসমিয়াও স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে, দেখা যাক।

ধুনিয়া নদীর দিকে ট্যারা মেরে বসে আছি
আবেলি আলোয়
রক্তে সঙ্ঘশক্তি বাড়ে, সকল ভাষার জন্য মমতা দ্বিগুণ বেড়ে যায়
ছোয়ালি ও মেয়েছেলে জড়াজড়ি পড়ে আছে ঘাসের কার্পেটে

নামঘরে চাকি জ্বলে, মাজারে মোমের শিখা; 'কে
যায় ? কে যায় ?'
মই হে আসাদ ভাই, পানীরাম বরা।'
কেনি যোয়া ? এ-রা !
নামঘরলৈ যাম। ককাদেউতা হলোঁ।

পাণ্ডুর সাথে সেই মাজুলির দেখা নাই।
কামপুর-মাজুলির তারপর
আর কোনো খোঁজ নাই।
'তোমার কিতাবখন দিয়া মোক এই কথাটুকু
আজ জপের মালার মতো নিশিদিন
ভোরের রেডিও যেন— ভুলে যাওয়া কোনো
বরগীত—
পাহাড়ের কোলে যেন গানে ভেজা
কোনো এক ফাঁকা নামের

এই শেষ কবিতায়, এক জায়গায় অসমিয়া লিপিতে 'র' লেখা হয়েছে। সচেতনভাবে এক বাস্তব, বাংলা কবিতায় দেখা যায় শুধু এই উত্তরপূর্বে। এই কবির একটি বাংলা কবিতার বইও রয়েছে, যার নাম, 'র'।

উত্তরপূর্বে লেখা কবিতায় কি শুধুমাত্র এই স্বর ? প্রকৃতি, প্রেম, দর্শন, চিত্রকল্প, অনুভব, একাকিত্ব, বিধূর উচ্চারণ, গূঢ় রহস্যময়তা নেই ? দেখা যাক।

কী ঠাণ্ডা ও
ছলোছলো চাহনি যার লালপেড়ে ঘোমটার
বেড়াটুকুতে একটি নৌকা বাঁধা
আছে।

প্রেমিকের রুমাল ও নীল খাম মাড়িয়ে সবুজ
তীরের মতো মহিলারা শাঁই ধাঁই হেঁটে যাচ্ছে শহর
রাজধানীর হৃৎপিণ্ডে। আগামী তিন-চার দশকের পর
শহরের আবর্জনা ও ময়লা আড়তের কাছে, এইখানে
আবিষ্কৃত হবে এক সম্রাটের কবর ও কারখানা।

মা চলে গেলেন নিয়ে শেষ রূপকথা
শূন্য খাটে পড়ে আছে কিছু বেলফুল

রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া আর কোনখানে আছে
প্রেমের প্রকৃত মুঠি, চোখ ও চুম্বন

সৌরশ্মশানের বুকে শীলমোহরের মতো জেগে
থাকে সেই দৃশ্য;
মায়ের মুখাগ্নি করে সন্তানের অকৃতজ্ঞ হাত।

সুখের ভিতর চিৎকার করে ফেলি, একজোড়া
দাঁতের ফাঁকে
গতকাল রাত্রির টেবিলে,
সুলভ ঊরুর নীচে শুয়ে আছে মিনারের বাঁদিকে
জাহাজঘাটার লাল শব্দ।

একদিন
গানের কথা সব ভুলে যাব
শুধু তার সুর
শীতের রোগা নদীর ত্বকে
আবছা নৌকোর মত
মনে থেকে যাবে

হাতের যে আঙুল অন্যের দিকে উঁচু হয়ে ওঠে
তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে, একজন গ্রামীণ
মহিলা দুই পা ঢুকিয়ে দিলেন অসহ্য উনোনে।
পোড়ালেন, আর পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমাদের
ফোটাতে চাইলেন নরম ভাতের মত, মাটির হাঁড়িতে।

তোমাদের ভাষা খুবই ক্যাডবেরি, মেনে নেওয়া গেলো।
তবুও ভাষার কিছু বাকি থেকে যায়।

বিষ যদি নীল হয়
ময়ূরের নীলের নাম ভালোবাসা

জলের কাছেই পাথর
পাথরে পুরাতত্ত্ব এবং পা
শবের মতোই ভাসে
জঙঘায় কাটা উল্কি ছিল না?

আলো নিয়ে আসো
এতো কাদা এই কলতলা
একটু তুলে ধরো শাড়ি
একটুকু ফ্যালো ছায়া

পৃথিবীতে এত জল
যে কোনো ছুতোয় তুমি চলে এসো

আমি একা
তুমি একা
কক্ষপথে
পৃথিবীও একা।

এই কবিতাগুলো একমাত্র উত্তরপূর্বে বসেই লেখা সম্ভব। ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধহয় নেই। উচ্চারণই প্রমাণ করে, এই স্বর এক অন্যভুবনের বাংলা কবিতা। শিলচর শহরকে কবির শহর বলেছিলেন, রামেন্দ্র দেশমুখ্য। আর অভিজিৎ চক্রবর্তী দেখেছেন, 'নখে হলুদ এইসব বাংলা কবিতার সঙ্গে গুয়াহাটি-শিলচরের বাসে আমার প্রায়শই দেখা হয়ে যায়'।

## চার

এবার কিছু নির্দিষ্ট কবিতা নিয়ে বলা যাক। প্রথমে অমলেন্দু গুহ-র 'বিহু' কবিতা। প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়েই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়, কবিতার সম্মুখে। ঠিক সেইভাবে, যখন 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পড়া শুরু হয়। "খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।" মনে পড়ে বিষ্ণু দে। 'ঝোড়ো হাওয়া ছোঁড়ে কালো কালো বুনো মেঘ চৈতী পূর্ণিমাকে।' অমলেন্দু গুহ 'বিহু' কবিতাটি শুরু করেছেন এভাবে, 'দৃঢ় উরু মেয়েদের পায়ে পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি।" কী অসম্ভব শব্দের সংযম। মাত্র ছয়টি শব্দে এঁকেছেন একটি চিত্র, যা লোকায়িত দৃশ্যময়তায় চূড়ান্ত নান্দনিক ছন্দে লালিত।

'বিহু' কবিতায়, অসমিয়া সমাজের বর্ণনা দেখা যাক। বিহু অসমের জাতীয় উৎসব। এই উৎসবে তিনটি বিহু পালন করা হয়। মাঘ বিহু বা ভোগালি বিহু, রঙালি বিহু বা বহাগ বিহু ও কাতি বিহু। মাঘ বিহু ভোগ-এর বিহু। এইসময় ধানকাটা শেষে ধান এসে গেছে গৃহস্থের ঘরে। ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করে পিঠে তৈরি করা হবে। মহিলারা সেই কাজে ব্যস্ত। ধান ভানছেন, মা-মেয়ে গান গেয়ে গেয়ে। এখন উৎসব, তাই আনন্দ, তাই গান। যে ধান পাওয়া গেছে, সে দিয়ে বছর চলবে কিনা সন্দেহ। মায়ের মন আশঙ্কায় ভরা, মেয়ের ওসবে মন নেই। এদিকে তাঁতশালও কর্মব্যস্ত। কে আগে তৈরি করবে সম্মানের, ভালোবাসার বিহুয়ান, মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। বহাগ বিহুতে প্রিয়জনকে উপহার দেওয়া হয়, এই ফুলের গামছা। অর্থাৎ, কবি মাঘ বিহু থেকে চলে আসেন বহাগ বিহুতে। এই কাজের মধ্যে কোথাও টিয়া পাখি ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে মন আনচান। হাত থেকে মাকু খসে পড়ে। বুকভরা আনন্দ যেন কীসের। খিলখিল হাসি, কাপাস তুলোর মতো ফেটে বেরিয়ে উড়ে যায়, ওই দূর আকাশে, মাঠ-ঘাটে, নদীর ঘাটে, যেখানে কৃষক ছেলেটি বাঁশি বাজায় আনমনে। মহিষ শিঙের বাঁশি, অর্থাৎ, পেঁপা বাজলেই, ফাগুনে আগুন জ্বলে দেহে, বিহু আসে।

বসন্তের আগমনে অনুষ্ঠিত হয় এই বিহু উৎসব। বহাগ বিহু, যৌবনের উৎসব। তাই মন আনচান করে। এই উৎসবে যুবক-যুবতীরা উদ্বেল হয়। কৃষি সংস্কৃতির শুরু থকেই এই ধরনের উৎসব চলে আসছে। যৌবনের সঙ্গে চাষের মাটির উর্বরতার সম্পর্ক আছে বলে লোক-বিশ্বাস।

যেহেতু যৌবনের উৎসব, প্রিয় মানুষটির সঙ্গে মিলন হবে। নাহর গাছের নিচে নতুন সাজিয়েছি ঘর। খোঁপায় গুঁজেছি কত না কপৌ ফুল, সুপুরি গাছকে জড়িয়ে ধরেছে পান গাছ। বছর বছর বিহু আসে, যায়, কত আর বিরহে কাটাব রাত্রি। এবার প্রিয়, আমার কাছে এসো।

যদিও শঙ্কায় থাকে মন, ছেলেরা বাঁশি বাজায়। মাদারের ডালে ডালে টকটকে লালের ইশারা। অকুলান হয় যদিও, বড়ো বড়ো গোলা সেঁচে ধান ঝরাব আঁচলে তোর। সখী, কাছে আয়, পাশে দাঁড়া। অর্থাৎ প্রেম। যৌবনের উৎসব তো, ভালোবাসার রঙিন আলো জ্বলবেই।

শিপিনি কুমারী, যে তাঁত বোনে, তার মনে যৌবনের আঁচ, স্বপ্নের জাল বোনে, বিহুর জন্য দিন গোনে, কবে আসবে উৎসব। যাব বিহুতলি, বিহু গানে নেচে উঠবে তরঙ্গায়িত শরীর। এই সুখ উছলে উঠবে, সারা দেশে, পাহাড়-উপত্যকায়, বনে, কমলাবাগানে। বিহু নৃত্য ছাড়া যে বিহু অসম্পূর্ণ। নাচ হবে ছন্দে, গানে, তরঙ্গতাড়িত হবে মন, শরীর।

ঢেঁকি শালে, তাঁত শালে, শতেক কাজের ভিড়ে, মেয়েরা উন্মুখ, প্রাণের হিল্লোল কবে প্রাণ পাবে গানের তুফানে।

বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী আসে। তার ডানায় করে নিয়ে আসে আয়োজন। সহস্র হৃদয় জুড়ে একই কামনা, বিহু আসুক তাড়াতাড়ি। কৃষকের মন উড়ু-উড়ু। শেষে, সেই ছন্দ, সেই আবেগ, সেই দৃশ্যপট, দৃঢ়উরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি।

থইথই সুখে কাঁটা দুরু-দুরু বুড়োদের মন
এবার বছর বুঝি কাটবে না ভাঁড়ারের ধানে
আহা ওরা সুখে থাক,গান গেয়ে ঢেঁকিকে নাচাক!
সুদিন আনুন হরি শূন্য বুক চাষির খোলানে।

অসমের জাতীয় উৎসব বিহু। এখানে ভাঁড়ারের ধানের কথা, ঢেঁকির কথা বলা হয়েছে। এই অনুষঙ্গগুলি দেখা যায়, মাঘ বিহুর সময়। কারণ, বহাগ বিহু, বসন্তের আগমনে পালিত হয়, গীত-নৃত্যে। যৌবনের সঙ্গে চাষযোগ্য মাটির উর্বরতার সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় যদিও, বহাগ বিহু, যৌবনেরই উৎসব। অন্যদিকে মাঘ বিহু বা ভোগালি বিহু, ভোগের উৎসব। এই বিহুতে খাওয়া-দাওয়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এইসময় ভাঁড়ারে ধান উপচে পড়ে। ধানকাটা শেষ, গৃহস্থের ঘরে এখন খাদ্যসম্ভার। ধনী-দরিদ্র, সকলের ঘরেই দু-মুঠি ধান-চাল খাওয়ার জন্য থাকে।

এই অংশে কবি বলতে চেয়েছেন যে, এটা উৎসবের সময়, আনন্দ করার সময়, খুশির সময়। তবুও কোথাও যেন এক অদৃশ্য কাঁটা গেঁথে থাকে মনে। বাড়ির যারা বয়স্ক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তাদের মনে এই আনন্দের মধ্যেও যেন কীসের শঙ্কা, ভয়। তারা যেন দেখতে পান অশনি সংকেত। বুক কাঁপে।

ধান তো উঠল ভাঁড়ারে। কতটুকু উঠল? সারা বছরের জন্য পর্যাপ্ত তো? যদি না-হয়, যদি বাড়ন্ত হয় ধান, তাহলে কী করে কাটবে পুরো বছর? অনাহারে থাকতে হবে না তো, পুরো কৃষক পরিবারকে? বুড়োরা জীবন দেখেছেন, প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন জীবনের পথে চলতে চলতে। অতএব, ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়, এই প্রবাদবাক্যের মতো ভয় পান। ধান বাড়ন্ত হলে কী হয়, সেটা তাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে।

তবু, আশায় জীবন, শুভকামনায় জীবন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কামনা করেন, সুখে থাক পরিবারের সদস্যরা, সুখে থাকুক উৎসবমুখী মানুষ। ঈশ্বরী পাটনীর সেই প্রার্থনার মতো, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। বুকে গান আসুক। কণ্ঠে গান আসুক। ঈশ্বর যেন সুদিন আনেন, চাষির ঘরে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন, "শ্রেণী-সচেতন গণজাগরণের পটভূমিকায় ভারতের প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনই আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস। আসামের পার্বত্য ও সমতল এলাকার মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল অধিকাংশ কবিতাতে তার সাক্ষর রয়েছে।"

'মা তুমি শিগগির ফিরে এসো' কবিতায় একটি মিষ্টি মধুর গল্প রয়েছে, যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। গল্প নয়, এরকম যাপন, শিলং পাহাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কবিতাটি শিলঙের পটভূমিতে লেখা, যেখানে এক মা, তার ছোট্ট শিশুকন্যাকে ঠাকুমার জিম্মায় রেখে জীবিকার জন্য বেরিয়ে যায়, আর শিশুটি, কবির ভাষায়, পাহাড়ের কোলে বাতাসে-দোলা ফার্ন পাতার মতো কচি হাতটা নেড়ে আধ-ফোটা ভাষায় কাঁদো কাঁদো সুরে ডাকতে

লাগল; তা তা, তা তা— ইম্মেই ওয়ান ক্লোয়— মা তুমি শিগগির ফিরে এসো। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মায়েরা কাজে বেরোয় আর সন্তানেরা তার ফেরার অপেক্ষায় থাকে।

একদিন এই মা আর ফিরল না বাড়ি। তখন যুদ্ধের সময়। এক বন্ধুর ওখান থেকে বাড়ি ফিরতে কবির দেরি হয়ে গেছে। মিলিটারিতে ছাওয়া শিলং শহর। তিনি ভয়ে ভয়ে টর্চ জ্বালিয়ে ফেরার পথে একটি শব্দ শুনে দেখেন, এক 'লোমশ মার্কিনি'র লালসার বলি হচ্ছে সেই মা, ইবনদি।

এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ঘটনায়, এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কবি ঘুমোতে পারেননি সারারাত। সহজ, সরল, পাহাড়ের মা একটু বাঁচতে চেয়েছিল, সাধারণভাবেই। সামান্য কয়েকটা জ্বালানি কাঠ ফেরি করত, জীবনের প্রয়োজনে, আর সারাদিনের জন্য রেখে আসত তার ফুলের মতো শিশুকন্যাকে বাড়ি। কী দোষ করেছিল সে, যে তার এমন করুণ পরিণতি হবে? কী হবে এখন তার শিশুকন্যার?

শিলং পাহাড়ে, খাসিয়া পুঞ্জিতে, সেই রাতে জাগছে আরেকজন। ছোট্ট এক শিশুকন্যা, ফুলকুমারী কাসান্থিউ। মা যখন কাজে বেরোয়, রোজ সে মাকে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। ফিরে আসার সময় সেই কখন পেরিয়ে গেছে, মা তো আসছে না। সে তো আর জানে না, মা আর কোনোদিনও ফিরবে না। মেয়ে ওসব বোঝে না। তাঁর, মাকে চাই, ভীষণভাবে চাই। মায়ের অনুপস্থিতিতে, শূন্য ঘরে, মায়ের জন্য, থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল, ফুলকুমারী কাসান্থিউ। 'ইম্মেই ওয়ান ক্লোয়'— মা তুমি শিগগির ফিরে এসো।

'মা তুমি শিগগির ফিরে এসো', কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি বর্ণনামূলক কবিতা, যেখানে একটি মিষ্টি কাহিনির সঙ্গে বিয়োগান্ত পরিণতি রয়েছে।

প্রকৃতির অনুপম বর্ণনার সঙ্গে মানব হৃদয়ের মিষ্টি মধুর কলতানের মধ্যেও রয়েছে এক হৃদয়মথিত হাহাকার।

শীত শেষ। পাইন গাছের পাতার শব্দে স্প্যানিশ গিটারের ধ্বনি। 'পুষ্পধেনু শর হেনেছে', পাহাড়ে এখন ফুলের সমারোহ। মাস এপ্রিল, অর্থাৎ বসন্তকাল।

পাশের বাড়ির দিন-মজুরনি খাসিয়া মেয়েটি, পিঠে 'থাপা' অর্থাৎ বেতের ঝুড়ি নিয়ে, তার ছোট্ট শিশুকে চুমু খেয়ে, ঠাকুমার কাছে রেখে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে শিশুটি কচি হাত নেড়ে মাকে কাঁদো কাঁদো সুরে বলছে, 'মা তুমি শিগগির ফিরে এসো'।

মা ও সন্তানের চিরকালীন ভালোবাসার অনুপম এক দৃশ্য রচিত হয়ে যায়। এই ভালোবাসা শাশ্বত। মায়ের মমতা, অমৃতসম। শিশুর এই আকুতি ছড়িয়ে পড়ে, ঝরনার বুকে, নিঃশব্দ পাথরে, 'ফুল-ঝরা হাইড্রেঞ্জিয়ার গালে'।

উমখ্রা নদীর বাঁকে এক নির্জন কুটিরের নীরবতা ভেঙে যায়,'বন-ভোমরার গুঞ্জরণ'-এর মতো একটি ডাক-এ। 'এ বাবু কাডিয়েং'। মধ্য বয়সী, আভরণহীন, বলিষ্ঠ বাঁকা ভঙ্গিমা, ঘাম-ঝরা গাল, পিঠে লাকড়ির বোঝা, সেই মা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, জীবিকার জন্য, এই কষ্টসাধ্য কাজ। কর্মই জীবন, এই শাশ্বত বাণী অনুসরণ করে।

শৈলাবাসের পরিচালক, যদিও জানে, খড়ির প্রয়োজন নেই, তবুও কেনা হয়। গালে একটা কোয়াই, অর্থাৎ কাঁচা সুপুরি, পান সহযোগে পুরে পয়সা গুনে মিষ্টি হাসি হেসে খাসি মেয়েটি চলে যায়। শাশ্বত মানবতা। প্রয়োজন নেই জেনেও অন্যকে সাহায্য করা।

খাসি মহিলার নাম, ইবন নংরুম। কবি ডাকেন ইকং ইবন, ইবনদি। সে আসে, বেচাকেনা হয়। 'অপ্রয়োজনের ঘনিষ্ঠতা' জমে ওঠে। 'ভাষার দুর্বোধ্যতা, ভাবে সহজ হয়'। অনেক অনুরোধে ইবনদি একদিন গান শোনান, হরিণ শিশুর জন্য হরিণ-মাতার বিলাপ। এ-যেন নিজেরই কান্না, ঘরে রেখে আসা ছোট্ট মেয়েটি, ফুলকুমারী কাসাহ্টিউয়ের জন্য চোখ ছলছল করে। মাতৃত্বের শাশ্বত অমোঘ টান।

যুদ্ধ শুরু হল। সাইরেন বাজে, মিলিটারির ছাউনি পড়ে খাসিয়া বস্তির পাশে। ইবনদি আর আসে না। একদিন শিশুর সারল্যে জানতে চেয়েছিল, যুদ্ধ কী? যুদ্ধ কেন হয়? 'পানাসক্ত কারফিউর শিলং', থমথমে। এক সন্ধ্যায় কবি বাড়ি ফিরছেন ভয়ে ভয়ে। 'হায়নাদের সন্ধানী চোখ, আঁধারে ঝলসে ওঠে, ঝোপে ঝাড়ে'। লুমমাউরির গলিপথে চলতে চলতে একটা শব্দ শুনে টর্চের আলো দেখেন, খোলা বুক লোমশ মার্কিনীর বাহুবেষ্টনীতে পিষ্ট, ইবনদি। যুদ্ধের আবহাওয়ায় আবহমানকাল থেকে লুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা, লজ্জা, সম্ভ্রম।

'মাঝরাতে হ্যাপিভিলার চূড়ায় ভয়ে ভয়ে চাঁদ উঠেছিল কুয়াশার ঘোমটা পরে।' এতই সন্ত্রস্ত সময়, যে, চাঁদও ভয়ে ভয়ে উঠেছে। ইবনদির সঙ্গে এই পাশবিক ঘটনা ঘটার পর, দেখার পর, কে শান্তিতে থাকতে পারে? সারারাত জেগেছিলেন তিনি। আর জেগেছিল, সুদূর খাসিয়া বস্তিতে, একটি ছোট্ট মেয়ে, ফুলকুমারী কাসাহ্টিউ। তাঁর মা আজ বাড়ি ফেরেননি। থেকে থেকে কেঁদে উঠছে সে, মায়ের আসার অপেক্ষায়। কাঁদছে, আর বলছে,'ইম্মেই ওয়ান ক্লোয়! মা তুমি শিগগির ফিরে এসো'।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা 'উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর', মাত্র ছয় পঙ্‌ক্তির। কিন্তু, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি রক্তাক্ত ইতিহাস। বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার দাবিতে ঝরে গেল এগারোটি তাজা প্রাণ। অসম রাজ্যভাষা বিল ১৯৬০-এর গণপ্রতিবাদে, আন্দোলনের উত্তাপ ছড়াতে থাকে ধীরে ধীরে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত পরিবেশে 'কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আন্দোলন শাখা-প্রশাখা মেলল সারা কাছাড় জেলায়। শহরে-গঞ্জে-গ্রামে। অভূতপূর্ব গণ আন্দোলনের শরিক হলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। ১৯ মে, ১৯৬১, বেলা দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহীদের ওপর সশস্ত্র বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। এগারোটি তাজা প্রাণ নির্বাপিত হল, মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায়।

সমগ্র বিশ্বে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে, প্রথম মহিলা শহিদ, কমলা ভট্টাচার্য। তিনিই, একটি পারুল বোন। রূপকথায় আমরা পাই, সাত ভাই চম্পা। এখানে দশটি ভাই চম্পা, দশজন শহিদের নাম, শচীন্দ্র পাল, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কানাইলাল নিয়োগী, বীরেন্দ্র সূত্রধর, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, সীতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, ও তরণী দেবনাথ।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কাব্যভাষার প্রবণতা জনপ্রিয়তা থেকে দূরে অবস্থান করে। তাঁর কবিতা সাবলীল নয়। বরং এক গূঢ় রহস্যময়তায় ঘেরা থাকে। ফলে, সোজাসুজি একটি মাত্র অর্থের দিকে ধাবিত হয় না তাঁর কবিতা। এই লিখনভঙ্গি আপাত কোনো স্বস্তি দেয় না। প্রচলিত ধারণার বাইরে এই শৈলী, যা একেবারেই নিজস্ব। বলা যায় একধরনের সান্ধ্যভাষা কাজ করে তাঁর কবিতায়। ক্ষণিক উচ্চারণও বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে আসে। তাঁর যতিচিহ্নের অধিক ব্যবহার, সাধারণ চলনের বিপরীতে এক আত্মানুসন্ধান।

আলোচিত কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি মন্ত্রের মতো উচ্চারিত। এই কবিতায় যে-অর্থে উচ্চারিত হয়, সে এক চলমান স্বীকারোক্তি। কিন্তু তাকে কবিতা থেকে বিযুক্ত করলেই ভেসে ওঠে এক দেশ, সেই দেশের আলো, হাওয়া, রৌদ্র, যেখানে চলাচল শুদ্ধ নিয়মে। এই দেশ যদি উত্তরপূর্ব, তো, আমাদের বাঙালিয়ানায় ঢুকে পড়ে

সেই পড়শিরও সংস্কৃতি। এই আমি যে বাঙালি, অসমিয়া, নেপালি, বোড়ো, কার্বি, মিজো, নাগা, অরুণাচলি সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে জুড়তে চাই এবং এটাই স্বাভাবিক, শুদ্ধ নিয়মে।

এই আলো হাওয়া রৌদ্রে আমাদের জীবনযাপন, শুদ্ধ নিয়মে। যে নিয়মে পৃথিবী কক্ষপথে ঘোরে, সে-ও তো শুদ্ধ। কাপড় শুকোয় —সুস্থ, স্বচ্ছ থাকা। আর ফাল্গুন ছড়িয়ে যায় দ্রুত। ভালোবাসার সময় আগত।

এই কবিতায় কবি পর্ব থেকে পর্বে চলে গেছেন নির্দ্বিধায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবিতা বোঝাবার জন্য নয়, কবিতা বাজবার জন্য। বুঝে ওঠা দায়, কিন্তু কাব্যগত ঝাঁঝটুকু মন বিবশ করে, তাঁর কবিতার হাত ধরেই আমরা আবার এই আপাত দুরূহতার বাইরে গিয়েও দেখি ছবি, শুনি ধ্বনি, এক দার্শনিক চেতনায় আচ্ছন্ন হই। এই কবিতায় বিপর্যয় দেখতে পাই। ‘বাজি পোড়ানোর পর যেন থাকে বিধিবদ্ধ বস্ত্রহরণ’, উৎসবের পরই, এক বিপর্যয়, স্খলন। ‘জ্যোৎস্নায় লুঠপাট হয় চৌকাঠে। এখানে বিপরীত চিন্তন। রূপময় প্রকৃতিতে বিপর্যয় আসে, এরপরই সুন্দরের গুনগান। একটি মেয়ে বসে থাকে চৌকাঠে, অর্থাৎ চিত্রময়তায় সুন্দর অথচ কীসের যেন অপেক্ষা। সমস্ত কবিতায় সৌন্দর্য ও তার বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন অনুষঙ্গে, রূপকে, সংকেতে, প্রতীকে। আপাত এক অর্থে বোধগম্য একমুখীন নির্মাণ। কিন্তু, শেষে এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণও দেখতে পাই। ‘পালা সাঙ্গ হলে চাই পরস্পর নিরস্ত্রীকরণ। দুরূহ এই কবিতার বহুমাত্রিক অর্থে লুকিয়ে রয়েছে কত না অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গের আড়ালে, বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের কথাই ভেসে আসে।

উত্তরপূর্বের আবহমানকালের এই যে বাংলা কবিতার স্বীয় স্বরটি আজও বহন করে চলেছেন তরুণ কবিরা। বিভিন্ন চেতনা ও কাব্যভাষায় নির্মাণ করে চলেছেন বাংলা কবিতা। বিষয় ভাবনায়, অনুষঙ্গে, কাব্য ইশারায় বহন করে চলেছেন সেই স্বীয় স্বর, যা প্রভূত কবিদের মধ্যে, অন্তরালে এক সুতোর সুর।

আমি শেষ করছি, অকালপ্রয়াত কবি, প্রবুদ্ধসুন্দর করের দুটি কবিতার উল্লেখ করে। তিনটি স্তবকে রচিত এই কবিতার প্রথম দুটি স্তবক।

*লুইত স্তবক*

এক

আমার দুচোখ ধুয়ে দিয়ো লুইতের জলে
আমার দুচোখ সারিয়ে তুলুন শ্রীময়ী কস্তুরী
পুরোপুরি দৃষ্টি ফিরে এলে দেখে যেতে চাই
উমানন্দ পাহাড়ের চূড়ায় নীলিম কুমারের শ্রেষ্ঠ কবিতার বই হাতে
ব্রহ্মপুত্রের দিঘল বাঁক দেখতে দেখতে ফুঁপিয়ে উঠছে
অনুতপ্ত পরেশ বরুয়া

দুই

ডি-এন-এ টেস্টের পর পুনরাবিষ্কৃত হবে
কেউ বাংলাদেশি নয়। অসমিয়া নয়।
বাঙালিও নয়।

জন্মযাযাবর প্রতিটি মানুষ
ভূপেন হাজরিকার কণ্ঠদেশে আপাতত আশ্রয় নিয়েছে।

এটাই আমাদের স্বর। এটাই আমাদের সমাজ বাস্তবতা। গোমতী তিরের, জাম্পুই পাহাড়ের, এক কবি, কেমন আত্মস্থ হয়ে যান ব্রহ্মপুত্রের তিরে এসে।

*আর্তি*

মেড়গাঁর পথ ধরে যেতে যেতে
কেউ বলেছিল, এই গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈরি হয়
শুনেই মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

কোনো এক গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়
কেউ যদি বলে ওঠে, এই গ্রামে একটি লাজুক তরুণ বাংলা কবিতা লেখে
এই কথা শুনে আমি যেন ভাবসমাহিত হই।

তাঁর দর্শন পেতে গেলে নির্জন কাঁদতে হয় খুব
গত তিন দশক তোমার জন্যে আমিও কি লুটিয়ে কাঁদিনি?
তোমার বিগ্রহ তবু আজও অধরাই থেকে গেল
যা কিছু দিয়েছে ধরা, মায়া ও বিভ্রম।

আমাকে দর্শন দাও, আবহমান বাংলা কবিতা
সমূহ বৈভব ছেড়ে প্লাবিত নয়নে বীতনিদ্র আমি তোমাকেই ডাকি
অন্তত আকাশে সেই কালো মেঘ আর
ধবল বকের সারি হয়ে দেখা দাও
যে-আকাশ দেখে মুর্ছা গিয়েছিল বালক গদাই।

আবহমান বাংলা কবিতার আসলে একটাই ভুবন। এই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে বাংলা কবিতা লেখা হচ্ছে, সে সমৃদ্ধ করে বাংলা কবিতাকে ই। উত্তরপূর্বে লিখিত বাংলা কবিতাও সেই কাজটি করে চলেছে, তার স্বীয় স্বর নিয়ে।

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ধন্যবাদ জানাই, আমাকে কবিতা নিয়ে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

একটি কথা বলেই শেষ করব। আমরা কবিতা পড়ব কেন, কেন শিল্পের রস গ্রহণ করব। বিনোদনের হাজারটা উপায় যখন রয়েছে। পড়ব, এইজন্যই যে, শিল্প-চেতনাকে আঘাত করে। তাকে পুষ্টি দেয়। আমাদের চিন্তাকে জাগায়, ভাবনাকে পুলকিত করে এবং আমরা এক অন্যধরনের আনন্দে ডুবে যাই।

# মেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা: অধিকার আদায়ের প্রারম্ভিক আখ্যান

জয়িতা দাস

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের শেষ দশক। মেয়েদের স্কুল যাওয়া নিয়ে রক্ষণশীলদের বিদ্রোহ তখন স্তিমিত হয়ে আসছে। সেই সময় প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছু শিক্ষিত উদার সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে মেয়েদের গানবাজনার চর্চা শুরু হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, একটা সময় প্রকাশ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিজাত পরিবারের এই মেয়েরা গান গাইতে এবং অভিনয় করতেও শুরু করে দেন। আর একদিন, সবাইকে চমকে দিয়ে হাজার মানুষের ভিড়ে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করেন এক বঙ্গললনা। সেই শুরু। মেয়েরা আর পিছু ফিরে তাকাননি। রক্ষণশীলদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই শুরু হয়েছিল নতুন যাত্রাপথে তাঁদের পথচলা। নিজেদের যোগ্যতায় সংস্কৃতির আঙিনায় মেয়েরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই লড়াইগাথাই এই নিবন্ধের বর্ণিত বিষয়।

বীজশব্দ: অন্তঃপুর শিক্ষা, উনিশ শতক, থিয়েটার, ঠাকুরবাড়ি, নাচগানবাজনা, বাইজি, ব্রাহ্মসমাজ, মানবীবিদ্যাচর্চা, রক্ষণশীলতা, সামাজিক ইতিহাসচর্চা ৷৷

ক.

সঙ্গীত নৃত্যাদি শিক্ষায় যে হিন্দু স্ত্রীগণের পক্ষে দোষ আছে, তাহা আমরা বুঝি না। কিন্তু উহা যে সমাজে হঠাৎ বা শীঘ্রই প্রচলিত হইবে সে আশাও খুব কম; কারণ আমাদের মধ্যে অনেকের

**জয়িতা দাস:** মেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা: অধিকার আদায়ের প্রারম্ভিক আখ্যান
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৩৩-৪৫

বিশ্বাস যে নৃত্য গীতাদি কুলস্ত্রীগণের কার্য্য নহে, উহা নির্লজ্জা কুলটা স্ত্রীগণের কার্য্য।... পূর্ব্বে যাঁহার স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার প্রতি বিদ্বেষ ছিল শুনিয়াছি, এখন সেই বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা মহাশয়কে স্কুলে যাওয়ার জন্য পৌত্রীর প্রতি তাড়না করিতে দেখিতেছি, নৃত্যগীতের পদ্ধতি স্ত্রীমহলে প্রচলিত হইলে কালে যে ইহা লেখাপড়ার মত সকলের দ্বেষ, তর্ক ও অমতাদি কাটিয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে না কে বলিল? অতএব একবার প্রচলন হইয়া দাঁড়াইলে কালে যে "নৃত্যগীত কুলটার কার্য্য" এ কথা সকলেই ভুলিয়া যাইবেন আশা করা যায়।[১]

খ.

সঙ্গীতের আমোদ যে নির্দ্দোষ আমোদ নয়, একথা আমাদের বিশ্বাস নয়। যদি কেহ বলেন যে, একটী কুলস্ত্রীর কণ্ঠস্বর ও বাদ্যের স্বর অনেক দূর যাইবে, ও মা কি লজ্জা! কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, শঙ্খ বাজান ও হুলু দেওয়া যাহা হয়, গীত বাদ্যাদিও কি তাহাই নহে? তাহাও তো শাঁখে একটানা ফুঁ দেওয়া ও জিভ নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হুলু দেওয়ার অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। ইহাতেও যদি কাহারও আর কোন কথা থাকে, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বাসরঘরে নূতন পরিচিত একটী পুরুষের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে সঙ্গীত করায় যদি লজ্জার গায়ে আঘাত না লাগে, তবে চিরপরিচিত আত্মীয়গণের নিকট বা তাঁহাদের কর্ণে যায়, এমন সঙ্গীতে বেশী লজ্জার বিষয় কি?'[২]

মাত্র একমাসের ব্যবধানে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। ওপরের উদ্ধৃতি দু'টি সেই লেখাগুলোর অংশ। প্রথম রচনাটি প্রকাশিত হয় 'বামারচনা' বিভাগে। শিরোনাম, 'সঙ্গীত চর্চায় কি দোষ'। প্রকাশকাল, ডিসেম্বর, ১৮৯২ সাল। লেখিকার পরিচয় অজ্ঞাত।

দ্বিতীয় লেখাটি একটি চিঠি। এখানেও পত্রলেখক নিজের কোনো পরিচয় দেননি। পত্রপাঠে জানা যায় তিনি গৃহবধূ। বসবাস তাঁর যশোরে।

উনিশ শতকের শেষ দশক। মেয়েদের স্কুল যাওয়া নিয়ে রক্ষণশীলদের বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসছে। অনেকেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। বাধ্য হয়েই। নব্য শিক্ষিত পুরুষদের চাহিদা তাঁদের আপোস করতে বাধ্য করেছে। প্রাচীনপন্থী অভিভাবকরা বাড়ির মেয়েদের স্কুলে না পাঠালে অন্তঃপুর-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এবার উদার-শিক্ষিত মহল একধাপ এগিয়ে মেয়েদের গানবাজনা চর্চার দাবি তুলতে শুরু করলেন।

এমন অনায্য দাবিতে স্বভাবতই রক্ষণশীলরা বিরক্ত। 'নাচগানের চর্চা-সে তো করে বাইজিরা! অভিজ্ঞতা তো তাই বলে। এবার ভদ্রঘরের বউ-ঝিরা গলা সাধতে শুরু করলে আর ধিন্ ধিন্ করে সবার সামনে নাচতে শুরু করলে বাইজীদের সঙ্গে কুলনারীর পার্থক্য আর রইল কোথায়!' অভিজ্ঞ প্রাচীনদের যুক্তি।

এই তুলনার জন্য প্রগতিপন্থীরা প্রস্তুত ছিলেন। ঝুলিতে তাঁদেরও শাণিত যুক্তি। যশোরের গৃহবধূর চিঠির কথাই ধরা যাক। পত্রলেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন, উলূধ্বনি কিংবা শঙ্খধ্বনির সঙ্গে গানবাজনার তো খুব একটা তফাৎ নেই। কই, সমাজের চোখে তো এই মেয়েলি আচার নিষিদ্ধ নয়! নিষিদ্ধ নয় বাসরঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে মেয়েদের গানও। তবে কেন গান-বাজনার চর্চা থেকে মেয়েদের ব্রাত্য করে রাখা!

চিঠির শুরুতেই লেখিকার স্বীকারোক্তি, 'যশোহরের অন্তর্গত ৪-৫ খানি গ্রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে পৃথিবীর

অন্য কোন স্থানই দেখা ঘটে নাই'। যশোরে বাস তাঁর। অন্যান্য অঞ্চলের স্ত্রী-আচার সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে যশোরের স্ত্রী-আচার যে বেশ ভালো করেই জানা আছে তাঁর, পত্রলেখিকা সে কথা জানাতে ভুলেননি। এই প্রসঙ্গে যশোর অঞ্চলে বধূবরণকালীন প্রচলিত স্ত্রী-আচারের উল্লেখ করেন তিনি। যে অনুষ্ঠানে 'সানাই ঢোল ও কাঁসী ইত্যাদি বাদ্যের তালে তালে চুড়ী ও বালা, হীরা, পান্না শোভিত হস্ত দুখানিকে নৃত্য করান' হয়। কুলবধূদের হাতে যখন নাচের মুদ্রা, তখন তাদের চারপাশের দর্শকদের ভিড়ে যে 'অপরিচিত বরযাত্রীগণ ও অন্যান্য স্ত্রী পুরুষগণ বাসী বিবাহের বরণের সময় সমবেত হইয়া থাকেন'— সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেননি তিনি।

জোরালো যুক্তি, তবে সহজ-সরল ভাষায় বেশ বিনীতভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি এই বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শানিত ব্যঙ্গের আভাসও। যাঁর দেখার-জানার জগৎ সীমিত, সেও যদি সামাজিক অনুশাসনের অসারতা অনুভব করতে পারে, চক্ষুষ্মানদের সেই ত্রুটি চোখ এড়িয়ে যায় কি করে! যেন লেখিকা পরোক্ষে এই প্রশ্নটিই লিঙ্গপ্রভুদের সম্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

আধুনিকতার ঝড়-হাওয়ার দাপটে বাংলার রক্ষণশীল সমাজমানস তখন কিছুটা বিধ্বস্ত। 'বামাবোধিনী'তে লেখা দুটি প্রকাশিত হ ওয়ার দু'দশক আগেই নববিধান ব্রাহ্মসমাজের এক ব্রাহ্মিকা মস্ত অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছেন। সেটা ১৮৭২ সালের কথা। নববিধানের সদস্যদের মধ্যে একদল সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁদের পরিবারের মেয়েরা প্রার্থনাসভায় চিকের আড়ালে বসার বদলে প্রকাশ্যে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পাশেই বসবেন।

ভাবনা কার্যে পরিণত হতে সময় লাগেনি। একদিন এই পর্দাবিরোধী দলের নেতা, দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী, স্বামীর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে চিকের আড়ালে না-বসে স্বামীর পাশের আসনটিতে টুক করে বসে পড়লেন। রক্ষণশীলদের ভুরুতে ভাঁজ। চিকের আড়ালে বসা মেয়েদের বুক ধুকপুক। আর ব্রহ্মময়ী! তিনি নির্বিকার। সেদিন প্রার্থনাসভায় গানও গেয়েছিলেন তিনি। অবশ্যই ব্রহ্মসঙ্গীত।

চারপাশে ছিছিক্কার। প্রকাশ্যে পুরুষদের সামনে বসে এক মহিলা গান করছেন, হলই-বা ব্রহ্মসঙ্গীত— রক্ষণশীলদের সহ্য হবে কেন! ক্রোধে ফেটে পড়লেন তাঁরা। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ দু-টুকরো হওয়ার উপক্রম। নব্যপন্থীরা বেপরোয়া। বরং কিছুদিনের মধ্যেই আরও একদল সাহসী মহিলা চিকের বাইরে ব্রহ্মময়ীর পাশে বসে তাঁর দল ভারি করে তুললেন।

প্রকাশ্য সভায় ব্রহ্মময়ীর এই গান মেয়েদের গানবাজনাচর্চার ইতিহাসে এক নতুন নজির তৈরি করলেও তা মেয়েদের সংস্কৃতিচর্চার অধিকার আদায়ের যে লড়াই, এর অংশ ছিল না। নব্যপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল পর্দাভাঙা। সেই উদ্দেশ্য সফল হতে মেয়েদের নাচগানের অধিকার নিয়ে আর তাঁরা মাথা ঘামাননি।

এরপর কেটে গেছে প্রায় আট বছর। সংস্কৃতি জগতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এবার আসরে নামল এক বিখ্যাত ব্রাহ্ম পরিবার। বলছি জোড়াসাঁকোয় অধিষ্ঠিত ঠাকুরদের কথা। বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতে তাঁদের দাপট তখন ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিবারের মেয়েরাই প্রথম ঘরোয়া আসরে মঞ্চে অভিনয় করেন। যদিও এই অভিনয় একান্তভাবেই ছিল 'আপনা-আপনির মধ্যে' সীমাবদ্ধ। পরিবারের বাইরের কোনো দর্শক এই অভিনয় দেখার সুযোগ পাননি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই উদ্যোগের মূল প্রেরণাদাত্রী ছিলেন ঠাকুর পরিবারেরই এক কুলবধূ, জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর নাম— বাংলাদেশে নারীস্বাধীনতার যিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

নাটকটির নাম, 'মানময়ী'। এই নাটকটিই 'বাড়ীর মেয়েদের লইয়া প্রথম অভিনয়।'[৩] পরিবারেরই এক

সদস্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গীতিনাট্যের রচয়িতা। (অবশ্য আদৌ নাটকটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা কি না, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে)। বাড়ির এক তরুণ সদস্য রবীন্দ্রনাথ সবে ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে। তিনি এই নাটকের সঙ্গে জুড়ে দিলেন 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি' গানটি। সেটা এপ্রিল, ১৮৮০ সালের কথা। গীতিনাট্যটি অভিনীত হয় জোড়াসাঁকোর এক ঘরোয়া আসরে।

তা হলই বা ঘরোয়া আসর, যে আমলে রাতের অন্ধকার ছাড়া পুরুষদের অন্তঃপুরে যাওয়া নিষিদ্ধ, সেই সময়ে ঘরোয়া আসরে মেয়েরা স্টেজে উঠে অভিনয় করছেন, এ কি সহজ কথা! মনে রাখতে হবে, তখনও পেশাদার মঞ্চে বারবিলাসিনীদেরই দাপট।

ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ অবশ্য বরাবর এমন উদার ছিল না। এমনকি এক দশক আগেও মেয়েদের জন্য গানবাজনার জগৎ ছিল নিষিদ্ধ। একেবারে নিষিদ্ধ বললে ভুল হবে। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বরে, সৌদামিনীর দরবারে বাইজি কিংবা খেমটাওয়ালিরা মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রায়ই হাজিরা দিতেন। কীর্তন, কথকতার আসরও বসত।

ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথের মহলে বাইজিরা ব্রাত্য। বাড়িতে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা ছিল পুরুষ সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুস্থ সংস্কৃতিচর্চায় দেবেন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না। বাড়ির ছেলেরা নাটক করতেন, সেই আসরে মেয়েদের উপস্থিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বারমহলে, ছেলেদের এইসব কাণ্ডকারখানার সাক্ষী হওয়ার জন্য বউ-ঝিদের একমাত্র ভরসা ছিল ঘুলঘুলির ছিদ্র।

সে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি চর্চার গোড়ার দিককার কথা। পরিবারের দুই ছেলে গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর তাঁদের এক বন্ধু কৃষ্ণবিহারী সেন যখন আর্ট স্কুলের ছাত্র, তখন তাঁদের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয়েছিল 'নবনাটক'। তারিখ ছিল পাঁচ জানুয়ারি, ১৮৬৭ সাল। নেওতা পেয়েছিলেন কলকাতার প্রতিটি সম্ভ্রান্ত-সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি। শহর উজাড় করে নাটক দেখতে জমায়েত হয়েছিলেন আমন্ত্রিতরা। সাহেবসুবোর দলও বাদ যাননি। সেবার ঠাকুরবাড়িতে টানা নয় রাত ধরে সমানে অভিনীত হয়েছিল নাটকটি।

বাড়িতে এই বিশাল যজ্ঞির আয়োজন, এদিকে বউ-ঝিদের মুখ ভার। অভিনয়ের মহলায় জলখাবারের জোগানদার তাঁরা। বারমহলের খুঁটিনাটি সব খবরই তাঁদের কানে আসে। এমন অভিনব কাণ্ডের সাক্ষী হতে কার না সাধ যায়!

তা বাড়ির পুরুষেরা নিরাশ করেননি তাঁদের। নাচঘরের পাশের ঘরে বসে ঘুলঘুলিতে নাটক দেখার বন্দোবস্ত হল তাঁদের জন্য। ঘরটিতে ছিল মাত্র দুটি ঘুলঘুলি। একটি দখল করে নিলেন বাড়ির গিন্নি যোগমায়া দেবী। অন্য ঘুলঘুলিতে ভাগাভাগি করে অন্যান্যরা।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সেই প্রথম অভিনয় দেখা। সে কি উত্তেজনা! এমন অভিজ্ঞতা কি ভোলা যায়! সেদিনকার পুঁচকে বধূরা যখন বাড়ির কর্ত্রী, তখনও তাঁদের স্মৃতিতে তাজা ছিল সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা।

তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মেয়েরাই যে প্রথম থিয়েটার দেখলেন, এমন নয়। এর এক বছর আগে ঠাকুরবাড়িরই এক জ্ঞাতি পরিবারের মেয়েরা সেই অভিজ্ঞতা প্রথম অর্জন করেছিলেন। সেই পরিবারের কর্তা ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। থিয়েটার পাগল লোকটি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছিলেন এক নাটক। অবশ্যই এর অশ্লীল অংশকে বাদ দিয়ে।

ততদিনে বেলগাছিয়া থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছে। নাট্যরসিক যতীন্দ্রমোহন নিজের বাড়িতেই তৈরি করে ফেললেন এক রঙ্গমঞ্চ। নাম দিলেন 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়'। তা শুধু রঙ্গমঞ্চই নয়, তৈরি হল এক কমিটিও।

কোন চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, সে ব্যাপারে শেষ কথা বলতেন এই নাটকনির্বাহক কমিটির সদস্যরাই। বিদ্যাসাগর থেকে মধুসূদনের মতো সেকালের দিগ্‌গজ ব্যক্তিরা সব এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

সাল ১৮৬৫। তারিখ ৩০ ডিসেম্বর। বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে। সেকালের ওস্তাদ খেয়াল গায়ক মদনমোহন বর্মন সাজলেন বিদ্যা আর মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুন্দর। সুন্দর আর রাজার পোশাক তৈরি হয়েছিল বর্ধমান আর অন্যান্য নেটিভ স্টেটের মহারাজাদের দরবারি পোশাকের আদলে। যতীন্দ্রমোহন কন্যা মনোরমা দেবী পদ্যে যতীন্দ্রমোহনের এক জীবনচরিত লিখেছিলেন। নাম, 'পিতৃদেব চরিত'। সেখানে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রসঙ্গ এসেছে। মনোরমা লিখেছেন:

ইংরাজিতে থিয়েটার পূর্বে হত জানি।
বাঙ্গালাতে অভিনয় করিলেন তিনি।।
পাকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে ভাব এত।
ঠিক যেন সহোদর ভাই মনে হত।
বেলগাছিয়ার বাগান তাহাদের ছিল।
সেইখানে থিয়েটার হবে ঠিক হল।।

এই মনোরমা সূত্রেই আমরা জানতে পারি, যে রাতে 'বিদ্যাসুন্দর' দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হয়, সেই রাতে বাড়ির মেয়েরাও থিয়েটার দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে প্রথম অভিনয়ের ঠিক এক সপ্তাহ পরের কথা। অভিনয় হয়েছিল যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতেই, পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে। দিনটি ছিল শনিবার। তারিখ, ৬ জানুয়ারি, ১৮৬৬। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মনে রাখতে হবে, এর আগে কলকাতার আর কোনো অভিজাত পরিবারের মেয়েরা থিয়েটার দেখার সুযোগ পাননি। যতীন্দ্রমোহনের উদারতায় অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছিল সেদিন। দাবি তুলেছিলেন মেয়েরাই। মনোরমা জানিয়েছেন:

মেয়েদের মুখে শুনি ভাবে মহারাজ।
মেয়েদের দেখানো হল সমুচিত কাজ।।
ভগ্নীপতিকে তখন বলিতে লাগিল।
অভিনয় মেয়েদের দেখাতে হইল।।[৪]

যতীন্দ্রমোহনের ভগিনীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় মেয়েরা সেদিন 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় দেখলেন। অবশ্যই পর্দার আড়ালে বসে। তা পর্দার আড়ালে বসলেও মেয়েদের এই 'বেহায়াপনা' রক্ষণশীলদের পছন্দ হয়নি। তবু যে তাঁরা চুপ করে রইলেন, সে যতীন্দ্রমোহনের ভয়েই। নইলে এই নিয়ে নিশ্চিত সেদিন জলঘোলা হত বিস্তর।

ফিরে আসা যাক জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রসঙ্গে। 'নবনাটকে'র পর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয় 'অশ্রুমতী' নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। সেবারের প্রকল্প আরও বিশাল। বাড়িতে স্টেজ বেঁধে নয়, অভিনয়ের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল পাবলিক স্টেজ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গোপন ইচ্ছে, তাঁরাও এই আনন্দের শরিক হন। গোপন, কারণ পর্দানশিন মেয়েরা থিয়েটার হলে গিয়ে অভিনয় দেখবেন, সেকালে এমন ইচ্ছে প্রকাশ করা ছিল গর্হিত অপরাধ।

ঠাকুরবাড়ির খড়খড়ি তখন ভাঙছে। বারমহলে খোলা হাওয়ার চলাচল। দু-একজন গিন্নি তাঁদের গোপন ইচ্ছের কথা প্রিয় পুরুষটির কানে তুলতে তাই ভয় পাননি। ঠাকুরবাড়ির তরুণ তুর্কিরা তাঁদের খোয়াইশ অপূর্ণ

রাখেননি। তাঁরা ধুয়ো তুললেন, ছেলেদের এই আনন্দে বাড়ির গিন্নি-বউ-ঝিদের ব্রাত্য করে রাখা উচিত হচ্ছে না মোটেই। বসল গোলটেবিল বৈঠক। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ছিল। ছেলেদের আনন্দের শরিক হবেন মেয়েরাও, সেদিন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমেই।

তবে বাস্তবে এর রূপ দেওয়া সহজ ছিল না মোটেই। ব্রাহ্মরা সমাজ ছাড়া বটে, তবে তাঁদের মধ্যেও পর্দার চল ছিল। ফলত ভাবনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য এই তরুণ তুর্কিদের হাঙ্গাম পোহাতে হয়েছে প্রচুর। অবশেষে মুশকিল আসানে এগিয়ে এলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রস্তাব, বাড়ির মেয়েদের থিয়েটার দেখানোর জন্য বেঙ্গল থিয়েটারটা একদিনের জন্য ভাড়া করা হোক। সেদিন ঠাকুর পরিবারের লোক আর অভিনেতারা ছাড়া আর কেউ থিয়েটার হলে উপস্থিত থাকবে না।

এই প্রস্তাবে অন্যরা আপত্তির কিছু দেখেননি। বরং প্রিন্স দ্বারকানাথের উত্তরপুরুষরা সেদিন বাড়ির মেয়েদের শখ মেটাতে রাজকীয় আয়োজনই করেছিলেন। সাধারণ দর্শকের মতো থিয়েটার হলের আসনে বসে ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের কী আর নাটক দেখা মানায়! অতএব ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব আসবাবপত্র দিয়ে থিয়েটার হল সাজিয়ে তোলা হয়। নিচে কার্পেট। চারপাশে ইজিচেয়ার, আলবোলা, ফুলের মালা।

মেয়েদের জন্য হলের একটা দিকে চিকের ঘেরও ছিল। বাড়ির বয়োবৃদ্ধ সদস্য দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃবধূ ত্রিপুরাসুন্দরী থেকে পরিবারের অনেক বয়স্ক মহিলারই সেই প্রথম থিয়েটার দেখা। তাও আবার হলে বসে। হলই বা পর্দার আড়ালে! সেকালের প্রেক্ষিতে এ এক দুঃসাহসী ঘটনা। পরবর্তীতে মেয়েদের গানবাজনার চর্চা কিংবা অভিনয়ের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যে নিয়ম ভাঙার লড়াই শুরু হয়েছিল, এর বীজ বপনের শুরু এই বিশেষ দিনটিতেই।

ঠাকুরবাড়ির অনেক কীর্তিরই তখন সাক্ষী হয়েছে শহর কলকাতা। ১৮৮১ সালের কথাই ধরা যাক। দিনটি ছিল শনিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি। সেদিন আবার শিবরাত্রি। ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা শহরবাসী বিদ্বজ্জনদের আমন্ত্রণ জানালেন নিজেদের ভদ্রাসনে। আমন্ত্রণপত্রে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল সন্ধে সাতটা। উপলক্ষ ভারতী উৎসব। আয়োজক 'বিদ্বজ্জন সমাগম'।

এর প্রায় সাত-আট বছর আগে 'বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে' জোড়াসাঁকোতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভাটি স্থাপিত হয়েছিল। সেবার ভারতী উৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয় এক 'অভিনব গীতি-নাট্য' 'বাল্মীকিপ্রতিভা'।

নারীমুক্তির ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে নামটি। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নামকরণের পরোক্ষ ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল; বাল্মিকীপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে"।[০০]

প্রতিভার বয়স তখন চোদ্দ কিংবা পনেরো। ভদ্র পরিবারের কোনো মেয়ের সেই প্রথম প্রকাশ্যে, অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে মঞ্চে অভিনয় করা।

স্টেজ বাঁধা হয়েছিল বারবাড়ির তেতলার ছাদে, পাল খাটিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি আর প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায়। দর্শকের আসনে, সভা আলো করে বসেছিলেন বিদ্বজ্জনেরা। কে নেই সেই সভায়! বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়— সেকালের সব বিখ্যাত ব্যক্তিরা উপস্থিত।

সে এক নাটক দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বটে দর্শকদের। স্টেজের ওপর ক্রৌঞ্চ মিথুনের বদলে পড়ে আছে দুটো বক। এর পেছনেও একটা গল্প রয়েছে। বাড়ির সব নাটকেই এতদিন অভিনয় করে এসেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই নাটকে অভিনয়ের বদলে তিনি কনসার্টের দায়িত্ব নিয়েছেন। তা অভিনয়ের দিন সকালে তাঁর মনে হল, ক্রৌঞ্চ মিথুনের জন্য আসল পাখির ব্যবস্থা করতে পারলে কেমন হয়! কিন্তু দুর্ভাগ্য, সমস্ত দিন এদিক-ওদিক ঘুরেও একটি শিকার মেলেনি। ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে আসছেন, রাস্তায় তখন এক ব্যাধের সঙ্গে দেখা। হাতে অনেকগুলো বক।

জ্যোতিরিন্দ্রের আনন্দ তখন দেখে কে! সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। সেই লোকটির কাছ থেকে দুটো বক কিনে, মেরে হাতে ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরলেন। যেন এক মস্ত যুদ্ধ জয় করা হল।

আইডিয়া হিট। স্টেজে সত্যিকারের বক দেখে দর্শকরা পুলকিত। আর অভিনয়! দর্শকরা বাক্‌রুদ্ধ। এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। অবন ঠাকুর একবার শখ করে অস্ট্রিচের ডিমের খোলা দিয়ে সুন্দর একটা ছোটো সেতার তৈরি করেছিলেন। সেই সেতারে রুপোলি রাংতা মুড়ে সরস্বতীর বীণা তৈরি হল। প্রতিভা বীণা কোলে সাদা পোশাক পরে স্টেজে যখন সোলার পদ্মফুলের ওপর এসে বসতেন, সবাই ভাবত বুঝি মাটির প্রতিমা।

প্রতিভার অভিনয় দেখে 'আর্য্যদর্শনে' রাজকৃষ্ণ রায় লিখলেন 'বালিকা-প্রতিভা' কবিতা:

পরনে গেরুয়া বাস, আলু থালু কেশ-পাশ
কি এক অপূর্ব্ব প্রভা উথলে ও বরাননে!
অলঙ্কার বলে কারে, ও বালিকা জানে নারে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।

প্রতিটি পত্র-পত্রিকা সেই সময় প্রতিভার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। ঠাকুরবাড়ির আর একটি মেয়েও সেদিন 'বাল্মিকীপ্রতিভা'য় অভিনয় করেছিলেন, নাম সুশীলা। শরৎকুমারীর বড়ো মেয়ে। নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় ছিলেন তিনি। খবরের কাগজ অবশ্য তাঁর অভিনয় সম্পর্কে নীরব। সম্ভবত প্রতিভার প্রতিভার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। সুশীলা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, প্রথমবার স্টেজে নামলেও আড়ষ্ট হবার মতো মেয়ে ছিলেন না তিনি।

অবশ্য 'বাল্মিকীপ্রতিভা'কে শুধু অভিনয় দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। অন্তঃপুরের পর্দার আড়াল থেকে মেয়েরা সরাসরি বেরিয়ে এসেছেন প্রকাশ্যে, মঞ্চে— সেদিন এই ঘটনার গুরুত্ব ছিল অনেক।

রক্ষণশীলরা অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেননি। ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'পিরালি বামুন তো, ওদের আবার সমাজ কী!'

প্রতিভা যে সেই প্রথম পর্দা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন, এমন নয়। এর আগেই গান গেয়ে তিনি মন জয় করে নিয়েছেন রসিক শ্রোতার। শুধু কী আর পর্দাভাঙা! মেয়েদের প্রথাগত সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রেও পথ দেখিয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার।

সেইসময় শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাবে ইংরেজি বাজনার চর্চা শুরু হয়েছে। অনেক অভিজাত পরিবারের অভিভাবকরা মেয়েদের মেম শিক্ষিকা রেখে পিয়ানো শেখাতে শুরু করেছেন। বাড়িতে সাহেব-মেমরা বেড়াতে এলে মেয়েরা তাদের সামনে বসে বাজান। বেশ বাহবা পাওয়া যায়। অভিভাবকরা তৃপ্ত। এর বেশি আর এগোবার কথা কেউ ভাবেননি।

না ভাববার কারণও ছিল! জ্ঞানদার ব্রাহ্মিকা শাড়ি চালু হওয়ার আগে শিক্ষিত বাঙালি পরিবারে মেয়েরা মেমদের অনুকরণে গাউন-হ্যাট পরতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তেমনই মেয়েদের পিয়ানো বাজানো শেখাতেও তারা আপত্তির কিছু দেখেননি। তবে ঘরোয়া পার্টির বাইরে প্রকাশ্যে কোনো মেয়েই পিয়ানো বাজিয়ে নিজেদের বিদ্যে জাহির করার চেষ্টা করতে যাননি। সেই সময় ওস্তাদ রেখে মেয়েদের দেশি গান শেখানোর কথা ভাবতে পারেননি কেউ। সমস্ত আগ্রহ থমকে ছিল ওই বিলেতি বাজনাতেই। আসলে মনে ছিল ভয়, যদি বাইজিদের সঙ্গে তুলনা করে কেউ! তাই অনাগ্রহ। পরিবারের মেয়েরা বাইজিদের মতো গান শিখলে পরপুরুষের কানে যাবে তাদের গলার স্বর— এই অস্বস্তিকর পরিবেশের কথা ভেবে নিয়ম-ভাঙতে আগ্রহী যারা, তারাও গান-বাজনার চর্চা থেকে বাড়ির বউ-ঝিদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

এ হেন মধ্যযুগীয় ভাবনাকে প্রথম অগ্রাহ্য করার সাহস দেখায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ওস্তাদ রেখে স্ত্রীকে গান শেখালেন। ছেলেমেয়েদেরও তাই। এই ব্যাপারে প্রথম পথপ্রদর্শক হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরই।

শুধু কী গান! তাঁর কন্যা মনীষার সূত্রে আমরা জানতে পারি, মুগুরভাজা থেকে তলোয়ার চালানো— হেমেন্দ্রনাথ মেয়েদের কোনো বিদ্যেই শেখাতে বাকি রাখেননি। মহিলা সমিতির এক অধিবেশনে মনীষা ছোটোবেলার শিক্ষালাভের সেই গল্প শুনিয়েছেন সবাইকে:

> তিনি আমাদের ছেলেবেলা হইতেই সাধ্য মতো স্বদেশি ও বিদেশি দুই রকম শিক্ষাই দিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। গৃহস্থালি রান্না হইতে, গান বাজনা ও ঢাল তরোয়াল খেলা, তির ধনুক... মুগুর ভাঁজা এবং বাংলা ও ইংরেজি সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, তিনি মাকে ও আমার বড়ো ভাই-বোনেদের প্রায় যত রকম দেশি বাজনা করতাল, বাঁইয়া, তবলা, বেহালা, সেতার, এসরাজ, সারঙ্গ, বীণ্ প্রভৃতি এবং আরেক দিকে পিয়ানো বাজনা, ছবি আঁকা, ডাক্তারি শিক্ষা, হার্প ও ইংরেজিতে স্বরলিপিতে হিন্দি গান স্বরলিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন।[৫]

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য হেমেন্দ্রনাথ তখন ঠাকুরবাড়ির স্বজনদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। নিজের মহলে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে সেখানে গড়ে তুলেছেন জ্ঞানদেবীর আবাস। বাড়িতে যে এত সব কাণ্ডকারখানা চলছে, যা নিয়ে সমাজ তোলপাড়— সেসব কিছুই স্পর্শ করেনি তাঁকে।

তাঁর সন্তানদের সঙ্গেও যোগ ছিল না ঠাকুরবাড়ির অন্য সদস্যদের। মহলের নিভৃত আড়ালে পিতার অভিভাবকত্বে ছেলেমেয়েরা তখন দেবী সরস্বতীর আরাধনায় মগ্ন। হেমেন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে প্রতিভা সর্বগুণে গুণবতী হয়ে ওঠার পরই প্রথম সেই মহলের বন্ধ দরজা খুলে যায়।

বেরিয়ে এলেন প্রতিভা। নিজেদের মহল ছেড়ে শুধু নয়, পর্দা ভেঙে বেরিয়ে এলেন প্রকাশ্যে, আমজনতার সম্মুখে। ভাইদের সঙ্গে ব্রহ্মসংগীত গাইলেন মাঘোৎসবের বিশাল জনসভায়। মেয়েদের গান-বাজনা চর্চার এক নতুন নজির তৈরি হল। তাঁকে স্বাগত জানালেন বাংলার রসিকসমাজ।

ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি-মুগ্ধ আধুনিক বঙ্গসমাজ প্রতিভার মতো প্রতিভাময়ী শিল্পীর আবির্ভাবে ভীষণ খুশি। 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভায় তাঁর গান আর সেতার শুনে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর রঘুনন্দন ঠাকুর মুগ্ধ। প্রতিভাকে শৌরীন্দ্রমোহন উপহার দিলেন স্বরলিপির বই, আর রঘুনন্দন দিলেন একটি বিশাল তানপুরা। কিছুদিনের

মধ্যেই প্রতিভার সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর দুই তুতো বোন সরলা ও ইন্দিরা দেবী। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পারিবারিক অবস্থান এমনই ছিল যে দীর্ঘকালের প্রাচীন রীতি ভাঙা সত্ত্বেও প্রতিভা দেবীদের কোনো সামাজিক প্রতিরোধের সামনে পড়তে হয়নি, বরং কলারসিকেরা তাঁদের উৎসাহিতই করেছেন। যদিও সেই সমাজ ছিল মুষ্টিমেয় লোকের। বৃহত্তর সমাজের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই বিপরীত ছিল। তাঁদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কুণ্ঠা ছিল সরলা দেবীদের মনে। বিশেষত বাইজিদের সঙ্গে তুলনার ব্যাপারটা ভেবে তাঁরা এতটাই সংকুচিত ছিলেন যে সরলা দেবীর মতো সেকালের দাপুটে জনপ্রিয় নেত্রীও পরবর্তীতে তাঁর আত্মকথায় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বাইজিদের তফাৎ কোথায়, এই বিষয়ে আত্মকথায় লিখেছেন তিনি:

> আজকাল বাঙলাদেশে মেয়েদের সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদতায় কেউ কি কল্পনা করতে পারেন এমন দিন ছিল যখন এই বাঙলায় ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল— যখন নিজের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল? তাইতো ১১ই মাঘে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গানের আকর্ষণে কলকাতা ভেঙে পড়ত। কিন্তু সে গান ধ্রপদী চালের গাম্ভীর্য রক্ষা করে গান— সে পেশাদারী গায়িকাদের টপ্পা ঠুংরি খেয়ালের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় চিত্তবিঘূর্ণক গান নয়।[৬]

টপ্পা-ঠুংরি তখনও জাতে ওঠেনি। বিলেতি গান নিয়েই তখন যত মাতামাতি। সাহেবসুবোদের অনুকরণে অভিজাত বাঙালিদের বাড়িতেও তখন ডো রে মি ফা-র ঝড়। পার্টিতে বাঙালি মেয়েরা পিয়ানো বাজিয়ে গান গেয়ে সাহেব-মেমদের সমীহ আদায় করে নিচ্ছেন। এ ধরনের পার্টিতে প্রতিভা আর সরলার কদর ছিল খুব। সেকালের দস্তুর ছিল মেয়েরা ষোলোতে পা দেওয়ার পর ডিনার পার্টিতে পা রাখার ছাড়পত্র পাবে। সরলার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। শাড়ি পরিয়ে চোদ্দ বছরের মেয়েকে পার্টিতে হাজির করা হয়েছে। অবশ্যই বঙ্গীয় সমাজের মান বজায় রাখার জন্য। সাহেব-মেমরা তাঁর গানে মুগ্ধ। মুগ্ধ তারা প্রতিভার প্রতিভায়ও। পিয়ানো বাজাতে প্রতিভা ওস্তাদ। ইংরেজি গানও গাইতেন চমৎকার। পার্টিতে পিয়ানো বাজিয়ে প্রতিভা ইংরেজি গান গাইতেন, আর সরলা গাইতেন দেশি গান।

সরলার সুরে তখন মজে আছেন রবীন্দ্রনাথও। 'বন্দে মাতরমে'র প্রথম দুটি লাইনের সুর ছিল তাঁর নিজের দেওয়া। বাকি অংশে রবিমামার অনুরোধে সরলা দিলেন সুর। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতাদের অনুরোধে বিভিন্ন সভায় প্রকাশ্যে স্টেজে উঠে তাঁকে গাইতে হত এই গান। পরে এমন হল যে সভায় তাঁকে দেখতে পেলেই দর্শক-শ্রোতাদের কাছ থেকে বন্দে মাতরম গাইবার জন্য অনুরোধ আসত। এমনকী এই গান নিষিদ্ধ হওয়ার পরও। তখন নেতারা পড়তেন উভয় সংকটে।

সরলা-প্রতিভাদের দেখেই সমাজ পালটায়। ক্রমে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিও ওস্তাদ রেখে মেয়েদের গান শেখাতে শুরু করে। রক্ষণশীলদের রক্তচক্ষু ছিল। পাশাপাশি একে উপেক্ষা করার সাহসও দেখিয়েছেন বিদ্রোহীরা। এমনকী সেই রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করছেন মেয়েরাও। পত্র-পত্রিকায় গান শেখার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তারা তখন লেখালেখিও শুরু করে দিয়েছেন। পূর্বে উল্লিখিত যশোরের গৃহবধূটি যেমন।

সংগীতচর্চায় শিক্ষিত মহলের আগ্রহ বাড়ছে দেখে প্রতিভা সেই সময় 'সঙ্গীত সঙঘ' নামে একটি গানের স্কুলও খুলেছিলেন। সেই স্কুলের ছাত্রীরা সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের। প্রতি রোববার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে সঙ্গীত সঙ্ঘের ক্লাস হত। সহযোগী হিসেবে তাঁর পাশে তখন ইন্দিরা আর সরলা। পাশাপাশি 'আনন্দ-সঙ্গীত' নামে একটি সংগীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন প্রতিভা। এই উদ্যোগেও প্রতিভার

পাশে ছিলেন ইন্দিরা।

কলকাতায় তখন মেয়েদের দুটি গানের স্কুল। প্রতিভার 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' আর মিসেস বি এল চৌধুরীর 'সঙ্গীত সম্মিলনী'। লীলা মজুমদারের কথায়, 'সঙ্গীত সঙ্ঘের একটু আভিজাত্যের গর্ব ছিল, সংগীত সম্মিলনী ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য।'

সংস্কৃতি জগতে ঠাকুরবাড়ি তখন একের পর এক ঝড় তুলছে। 'রাজা ও রানী'র অভিনয় নিয়েও সেই সময় কম জলঘোলা হয়নি। রাজা বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রানি সুমিত্রা সেজেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। দেবদত্ত-নারায়ণী সত্যেন্দ্রনাথ আর মৃণালিনী, কুমার ও ইলা প্রমথনাথ-প্রিয়ম্বদা।

অন্য সব নিষিদ্ধ সম্পর্ক তো দূরের কথা, ভাসুর-ভাদ্র বউ সম্পর্কও মানা হয়নি নাটকে। এই নিয়ে চারপাশে ঢি-ঢি পড়ে যায়। প্রতিমা দেবী লিখেছেন:

> সেকালে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সে কেবল ও বাড়িতেই সম্ভব হয়েছিল। সমাজের পাথরের দেয়াল ভেঙে ফেলে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। তখনকার দিনেও ও বাড়ির মেয়েরা ঘোড়ায় চড়েছেন, স্টেজে নেবেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। সমাজ আতঙ্কিত চিত্তে তাকিয়ে থাকত তাদের দিকে একটা উদ্ভট কিছু দেখবার জন্য। তাঁদের চালচলন সমাজের চোখে তাক লাগিয়ে দিত শেষে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না করতে পেরে সাধারণ লোকে বলত, 'ওঁরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী'। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের পক্ষে সবই সম্ভব। এই যুগান্তর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত নবসংস্কৃতির এই বিকাশ ঘটেছিল বাঙলার এই পরিবারের মধ্য দিয়ে, মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মিলিত চেষ্টায়। সেই প্রভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার ঘরে ঘরে।[৭]

শিক্ষিত মুসলমান পরিবারেও এর প্রভাব পড়েছিল কিছুটা। সংখ্যায় নগণ্য হলেও এর বেশ কয়েক বছর পরে কয়েকজন মুসলমান মেয়ে গান শিখতে শুরু করলেন, তবে প্রকাশ্যে নয়— নিভৃতে, গোপনে। "মুসলমান সমাজে তখন মেয়েদের গান গাওয়া শুধু বেপর্দার কাজ নয়, বেশরিয়তি কাজ। আমি দোতলার একটা ঘরে জানালা বন্ধ করে গান গাইতাম। মাস্টারের কাছে গান শেখার প্রশ্নই ওঠে না।"[৮]— জানিয়েছেন হামিদা খানম। সেই আমলের মুসলমান সমাজের প্রথম শিক্ষিত নারীদের মধ্যে একজন তিনি। হামিদার নানা আর আব্বু দুজনেই ছিলেন সরকারি স্কুলের পরিদর্শক। শিক্ষিত পরিবার। গানবাজনার চর্চা তাঁদের সমাজে গুণাহ। হামিদার আব্বু-আম্মা কিন্তু সেই নিষেধের গণ্ডি ভাঙতে দ্বিধা করেননি।

হামিদা তখন স্কুলে পড়েন। খালা সিদ্দিকা আর দিদি লিলির সঙ্গে এক ছুটিতে তিনি কলকাতায় বেড়াতে এলেন। এই সিদ্দিকা সাহিত্যচর্চা করতেন। সাহিত্য আসরগুলিতে পর্দার আড়ালে না বসে পুরুষদের পাশে বসতেন বলে তাঁকে নিয়েও কম হইচই হয়নি।

সিদ্দিকা কলকাতায় এসেছেন খবর পেয়ে আব্বাসউদ্দিন ছুটে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় সিদ্দিকার মুখে যখন শুনতে পেলেন হামিদা গান গাইতে জানেন, তখন তাঁকে একটা গান গাওয়ার অনুরোধ করেন। হামিদা গান শুনিয়েছিলেন। আব্বাসউদ্দিন মুগ্ধ। তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এই মেয়ের গান রেকর্ড করতে হবে। ঠিক হল, গরমের ছুটিতে হামিদা আবার আসবেন কলকাতায়। তখন গান রেকর্ড করা

হবে। এর আগের ক'মাস শুধুই রেওয়াজ। এসব ঘটনা সম্ভবত বিশ শতকের তিন-চার দশকের। হামিদার জন্ম ১৯২৩ সালে।

হামিদার তখন সে কী আনন্দ! অবশ্য সেই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাবনায় ফিরতেই এক লহমায় উবে যায় তাঁর সমস্ত উল্লাস। হামিদার গান রেকর্ড হবে, ঘনিষ্টমহলে এ কথা গোপন রাখা যায়নি। খবর শুনে আত্মীয়-স্বজনরা মনঃক্ষুণ্ণ। খান বাহাদুর সাহেবের নাতনির গান রেকর্ড হবে, সিনেমা হল থেকে পানের দোকান— সব জায়গায় শোনা যাবে তাঁর গলা, এই নিয়ে আত্মীয়-পরিজনদের সেকি হা-হুতাশ! তাছাড়া তাঁদের নিজেদেরও তো একটা মান-সম্মান আছে! পরিবারের মেয়ে গান গেয়ে বেড়ালে সমাজে তাঁরা মুখ দেখান কী করে! আত্মীয়দের মান রাখতে হামিদা বাধ্য হয়ে তাঁর স্বপ্নকে কুরবানি দিলেন।

কচি বয়সে স্কুলের ফাংশনে 'তৎপরম পরেমেশ্বরম' সংস্কৃত শ্লোকটি গেয়ে সংগীত-পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর। সেই যাত্রা থেমে গেল মাঝপথে। এর বেশ কয়েকবছর পর হামিদা যখন বেথুন কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, তখন কলেজ ইউনিয়নের ড্রামাতে গান গেয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেবার অভিনয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্রের বড়ো দিদি, হামিদার সহপাঠী সুজাতা। সেই খবর অবশ্য হামিদার রক্ষণশীল আত্মীয়দের কানে ওঠেনি।

সন ১৯১৭। সেবার নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সংগঠনের (আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম) প্রথম অধিবেশন হয়েছিল লোয়ার সার্কুলার রোডে। সভানেত্রী আয়েশা খাতুন। পঞ্চাশজন পর্দানশিন পরিবারের মহিলা যোগ দিয়েছিলেন এই অধিবেশনে। পরের বছর সংখ্যাটা বাড়ল। সে বছর যোগ দিলেন ষাটজন মহিলা। সবাই পর্দানশিন। সভানেত্রী ছিলেন লেডি শামসুল হুদা।

সংখ্যাটা ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়। এর চোদ্দ বছর পর ১৯৩২ সালে মুসলিম মহিলা সংগঠনের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় তিনশো মহিলা। এমনকী কিছু হিন্দু মহিলাও সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল মৌলভি শামসুদ্দিন আহমদের বাড়িতে সেবার অধিবেশন বসে।

সেবারের অধিবেশনে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেছিলেন মিস জাহানারা চৌধুরী। কাজি কামরুন নাহার চৌধুরী আবৃত্তি করেন নজরুলের 'মহররম' কবিতা। কামরুন নাহার সেই সভায় এসরাজও বাজিয়েছিলেন। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু মেয়েরাও। কল্যাণী দাস আর তরুপ্রভা ঘোষ নামে দুই মেয়ে নাচ ও গান করেন।

ইসলামি বিধান অনুযায়ী মেয়েদের নাচ-গান নিষিদ্ধ। অধিবেশনে নাচ-গানের আয়োজন দেখে বোঝা যায়, মুসলিম পরিবারগুলিতেও তখন পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। অধিবেশনে যোগ দেওয়া সদস্যদের সংখ্যা ছয় গুণ বেড়ে যাওয়া এর সাক্ষ্য দেয়। সে বছর আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন বেগম রোকেয়া।

মেয়েদের গান-বাজনার চর্চা যদিও-বা সমাজ মেনে নিয়েছিল, নাচের ব্যাপারে তাদের রক্ষণশীলতা সহজে কাটেনি। প্রতিভা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার পঁয়তাল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পরও ভদ্র পরিবারের কোনো মেয়েকে স্টেজে নাচতে দেখা যায়নি। কারণ, "সে সময়ে ভালোঘরের মেয়েরা বল্ ড্যান্স যদি-বা করত; ভারতীয় নাচ ছিল নাচ্‌ওয়ালীদের একচেটিয়া ব্যাপার।" রবীন্দ্রনাথও তখন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের নিয়ে নাচের অনুষ্ঠান করতে সাহস করেননি।

বাঙালি ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে প্রথম সেই নিয়ম ভাঙলেন রেবা রায়। সেটা ১৯২৬ সালের

ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সৌমেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রমিক-কৃষক দলের সদস্য। পার্টি-কর্মীদের প্রচণ্ড দুর্দশা চলছে তখন। দু-বেলা ঠিকমতো খাবারই জুটছে না। সমস্যার সমাধানে সৌমেন্দ্র অস্থির তখন। রাতদিন একটাই চিন্তা তাঁর, কীভাবে টাকার ব্যবস্থা করা যায়! হঠাৎ মাথায় এল এক বুদ্ধি, একটা জলসার আয়োজন করলে কেমন হয!

এলবার্ট হল ভাড়া করা হল। গান গাইলেন নজরুল, নলিনীকান্ত সরকার এবং আরও অনেকে। সৌমেন্দ্র নিজেও ছিলেন সেই গায়কদের দলে। যা টাকা উঠল, তুলে দেওয়া হল পার্টির লোকদের হাতে। কিছুদিন চলল সেই টাকায়। তারপর যে কে সেই।

অতএব, আবারও জলসার আয়োজন। এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল ভাড়া করা। এবার হবে 'ঋতুচক্র'। সৌমেন্দ্র 'নানা ঋতুর গানের ফুল গেঁথে নিয়ে তৈরী' করেছেন এই সুরের মালা। এদিকে সৌমেন্দ্রের মাথায় ঘুরছে তখন অন্য এক ভাবনা। রেবার স্বাভাবিক নৃত্য প্রতিভার কথা তাঁর জানা ছিল। সৌমেন্দ্র ভাবছেন, অনুষ্ঠানে রেবাকে দিয়ে যদি একটা নাচ পরিবেশন করানো যায়, তবে বেশ হয়।

রেবাকে বলতে এককথায় মেয়ে রাজি। তাঁর শর্ত শুধু একটাই, বাবার অনুমতি নিতে হবে। রেবার বাবা অনুমতি দিয়েছিলেন। এবার জল্পনা, কোন গানের সঙ্গে নাচা যায়!

এদিকে রেবা যে নাচবেন, দলের আর কেউ তা টের পাননি। ইচ্ছে করেই গোপন রাখা হয়েছিল। ভয় পেত সবাই। বাধা দিত। সমস্ত প্ল্যান হয়ে যেত ভণ্ডুল। রেবাকে জানানো হয়েছিল, কারণ নাচতে হবে তাঁকেই। কথাটা তাই রেবা, তাঁর বাবা আর সৌমেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনুষ্ঠানের রাতে শেষ গান 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'— যখন শুরু হল, পূর্বপরিকল্পনা মতো রেবা তখন "গানের দল থেকে বের হয়ে এল উল্কার মতো স্টেজের মাঝখানে, গানের হালকা ছন্দের সঙ্গে শুরু করে দিল চপল নৃত্য।"[৯] লিখেছেন সৌমেন্দ্রনাথ। তাঁর আত্মজীবনীতে।

লীলা মজুমদারও ছিলেন সেদিনের সেই যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী। লীলা আর তাঁর দিদির যখন ডায়োসেসানের হস্টেলে বসবাস, তখন সমবয়সী রেবাও ছিলেন সেই হস্টেলে। আবার একই সময়ে তাঁরা ছিলেন 'সঙ্গীত সম্মিলনী'রও ছাত্রী। সেদিনের অনুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে আত্মজীবনীতে লিখেছেন তিনি, রেবা যে চমৎকার নেচেছিলেন, সে কথা স্বীকার করতে সকলে বাধ্য হয়েছিলেন। আলাদা করে উল্লেখ করেছেন তিনি রেবার সাজগোজের কথাও। কণ্ঠার হাড়ের ওপরে, কনুইয়ের নিচে আর পায়ের কব্জির নিচে ছাড়া, শরীরের আর কোনো অংশ তাঁর দেখা যায়নি। তবু ভদ্রলোকের মেয়ে স্টেজে চড়ে নাচল বলে শহরময় ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছিল।

এই ঢি-ঢির মধ্যেই রেবার পা ছুঁয়ে সেদিন তৈরি হয়েছিল এক নজিরবিহীন ইতিহাস: "প্রকাশ্যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বাঙলা দেশে রেবার আগে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে নৃত্য করেনি।... এ বিষয়ে রেবা পথকারিণী। সেই সর্বপ্রথমে পথ দেখিয়েছে। এর জন্যে কম বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করতে হয়নি।"[১০] লিখেছেন সৌমেন্দ্রনাথ, তাঁর স্মৃতিকথায়। শুধু রেবা নন, অপমানিত হয়েছেন সৌমেন্দ্রও। 'সঞ্জীবনী' এবং অন্যান্য পত্রিকা তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। এর জবাব দিয়েছিলেন সৌমেন্দ্র। জোড়াসাঁকোতে আবারও নাচগানের আসর বসিয়ে। সেবার 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি' গানটির সঙ্গে নাচলেন চিত্রা, নন্দিতা আর সুমিতা।

"'নীতিবাগীশদের কাঠমোল্লাইগিরির উত্তর দিলুম আমি সেদিন এমনি করে। নৃত্যের অনুষ্ঠান একটির পর

একটি করে আমি এদের ধাক্কা দিয়ে যাব এই ছিল আমার সংকল্প"— সেই সংকল্পে সফল হয়েছিলেন সৌমেন্দ্র। ভরসা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সৌমেন্দ্রের কাণ্ডকারখানা দেখে। দ্বিধা কেটে গেল তাঁর। এর কয়েক মাসের মধ্যেই 'নটীর পূজা'র আয়োজন। এবার দল বেঁধে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা নাচলেন প্রকাশ্যে, কবির উদ্যোগে। বাকিটা ইতিহাস। ক্রমে "রক্ষণশীলদের দাপট ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল তাদের মনের ভীরু অন্ধকারের মধ্যে।"

## সূত্র

১. স্বপন বসু (সম্পা.), 'সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ', ২য় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ৫০৯।

২. তদেব, পৃ. ৫১০।

৩. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', কলকাতা: আনন্দ, পৃ. ৬৫।

৪. চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল', কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃ. ২৯৬।

৫. প্রত্যুষকুমার রীত (সম্পা.) 'ঠাকুরবাড়ির সুষমা: মনীষা দেবীর অগ্রন্থিত রচনা', কলকাতা: পারুল, ২০১১, পৃ. ১১৩।

৬. সরলা দেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা', কলকাতা: রূপা, ১৯৭৫, পৃ. ৭৩ ।

৭. প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র: রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য', কলকাতা: দে'জ, ১৪১৩ ব., পৃ. ২০।

৮. হামিদা খানম, 'ঝরা বকুলের গন্ধ: স্মৃতি আলেখ্য', ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ৩৬।

৯. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', কলকাতা: বৈতানিক, ২০০৩, পৃ. ৬৭।

১০. তদেব।

# স্বর্ণকুমারী দেবীর দৃষ্টিতে নারী পরিসর

মধুপী পুরকায়স্থ

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। পুরোনো প্রথাগত জীবন থেকে উত্তরণের কাল। সেই সময়ই আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বেশিরভাগ মেয়েরাই বাইরের জগতের স্পর্শ পায়নি, সেই সময় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এক স্বতন্ত্র জীবনযাপন করেছিলেন। সমগ্র দেশে ও নিজ পরিবারে যে সংস্কারমুখী পরিবেশ প্রবহমান ছিল, তার প্রভাব সাহিত্যজীবনের সহায়ক হয়েছিল। অসহায় নির্যাতিত অন্তেবাসী নারীর মর্মবেদনাকে স্বর্ণকুমারী গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চাইতেন মেয়েদের মধ্যে আত্মশক্তি জেগে উঠুক। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তাঁর এই সচেতন মননের স্বাক্ষর রূপ পেয়েছিল উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ ও 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনায়। তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতে তিনি চেয়েছিলেন যুগের বাধাকে অতিক্রম করে যেতে। তিনি এমন একটি যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে যুগের মেয়েদের ইচ্ছে থাকলেও সেই ইচ্ছেকে রূপায়িত করার শক্তি ছিল না। গভীর আত্মমগ্নতার ভেতর দিয়ে তিনি জীবনকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। নারী জাগরণের সন্ধিকালে পুরুষের সম-অধিকার লাভের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, সেই ইতিহাসকে জানতে হলে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যকর্মকে স্বমহিমায় তুলে ধরা প্রয়োজন।

বীজশব্দ: উপন্যাস, ঊনবিংশ শতাব্দী, নবজাগরণ, নারী পরিসর, স্ত্রীশিক্ষা, স্বর্ণকুমারী দেবী ॥

**মধুপী পুরকায়স্থ:** স্বর্ণকুমারী দেবীর দৃষ্টিতে নারী পরিসর
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪৬-৫৩

> যতই ব্যতিক্রমী জীবনচর্যা এবং চর্চায় বেড়ে ওঠা হোক না কেন, সমকাল থেকে মানসিকভাবে এগিয়ে না থাকলে স্বর্ণকুমারী দেবী হওয়া যায় না।[১]

স্বর্ণকুমারী দেবী যখন সাহিত্যরচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন সমাজের আবহাওয়া মেয়েদের লেখালেখির অনুকুলে ছিল না। এই রক্ষণশীল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও স্বর্ণকুমারী মেয়েদের জীবনসমস্যাকে গভীর বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন। তাঁর লেখনীর মধ্যে তাঁর সমাজসচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

লিঙ্গনির্দিষ্ট সমাজে মেয়েরা যে চিরকাল অপাঙ্‌ক্তেয় এই সত্যটিকে স্বর্ণকুমারী উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মননের প্রতিক্রিয়া সচেতন রূপ পেয়েছিল তাঁর উপন্যাসে।

যুক্তি দিয়ে বিষয়বস্তুর বিচার এবং গোষ্ঠীচেতনার পরিবর্তে ব্যক্তিচেতনাকে মূল্য দেওয়া ছিল নবজাগরণোত্তর দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য। নারীও একজন ব্যক্তি এবং ব্যক্তিরূপে নারীকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন, তারই দৃপ্ত প্রকাশ স্বর্ণকুমারীর লেখনী।

তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে গভীর বিশ্লেষণী এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি মেয়েদের জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন। লিঙ্গবিভাজন একটি বড়ো সামাজিক সমস্যা। লিঙ্গবৈষম্য থেকে আজকের সমাজও মুক্ত নয়। স্বর্ণকুমারী সমাজের এই সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

> বাল্যকাল থেকে ঠাকুর পরিবারের স্নিগ্ধ-মধুর সাংস্কৃতিক বৃত্তে পাক খেয়ে, পরবর্তীকালে স্বামীগৃহে সহানুভূতি সহমর্মিতার আস্বাদনে থেকেও স্বর্ণকুমারী জানতেন জীবনের বিচিত্রতার এটি একটি অংশমাত্র, কণ্টক আবৃত আরো একটি জীবন অপেক্ষা করে আছে এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে; অভিজ্ঞতার নিরিখে সেইসব নারীদের যন্ত্রণার কথা বিবৃত করতে কদাচ ভুলে যাননি তিনি, এখানেই ঔপন্যাসিকের সমগ্রার্থ স্বর্ণকুমারীর ওপরে আরোপ করা যায়।[২]

'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) ও 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯২-৯৩) উপন্যাস দুটিতে মেয়েদের জীবনে আর্থিক স্বনির্ভরতার যে কত প্রয়োজন তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন লেখিকা। উনিশ শতকে প্রতীচ্য শিক্ষা ও ভাবনার আলোক সর্বাধিক ছাপ ফেলেছিল যে ঠাকুর পরিবারে স্বর্ণকুমারী সেই পরিবারের কন্যা ছিলেন। ইংল্যান্ডের স্বাধীনচেতা স্বনির্ভর মেয়েদের জীবনযাপনের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরনির্ভর শিক্ষাহীন মেয়েদের ভাগ্যের তিনি তুলনা করেছিলেন:

> সে দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত নিতান্তই কৃপার পাত্র হয়ে। জন্মায় না, বাপের ধনে ছেলেদের মত তাদেরও একটা অধিকার আছে।... আর যারা নেহাৎ সঙ্গতিহীন, তারাও শিক্ষার গুণে নিজ জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম।[৩]

বিধবা বিবাহই যে বিধবা সমস্যার একমাত্র সমাধান এ কথা স্বর্ণকুমারী মনে করতেন না। কারণ অনেকেই বিধবাবিবাহের সুযোগ বহুবিবাহ করত। স্বর্ণকুমারী চেয়েছিলেন মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। সেজন্যই অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় এবং অসহায় কুমারী ও বিধবাদের স্বনির্ভর জীবন গড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'সখি সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:

> ... বিধবা ও কুমারী মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী করে তোলা। তখনও মেয়েরা বিশেষতঃ বিবাহিতারা স্কুলে পড়তে আসতো না অথচ লেখাপড়া

> শেখার আগ্রহ বেড়ে গেছে। তাই ঘরে ঘরে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন-- তাদের অভাবে শিক্ষক কিংবা বিদেশীনি মেমসাহেব নিয়োগ করা হতো। স্বর্ণকুমারী দেখলেন বাঙালী মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অনায়াসেই এই কাজটি পেতে পারে। অর্থোপার্জনে স্বনির্ভর হলে অনাথা বিধবাদের জীবনযাত্রা যে সহজতর হবে তাতে সন্দেহ ছিল না।[৪]

এ প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছিলেন:

> প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে এইরূপ সভাসমিতিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশের কাজ করান যে কতদূর দুরূহ ছিল, তাহা আধুনিকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। স্বর্ণকুমারীর ন্যায় উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি রমণী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বলিয়াই এই সমিতি সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং উহার চেষ্টায় বহু দরিদ্র কন্যা সুশিক্ষা লাভ এবং বহু সম্ভ্রান্ত গৃহের বিধবা মহিলা অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।[৫]

স্বর্মকুমারী চেয়েছিলেন দাসত্ব ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েরা আত্মশক্তিতে জেগে উঠুক। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই (মুম্বই) শহরে এবং ১৮৯০-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা ডেলিগেট রূপে যোগদান করে দেশের নারীসমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

হিন্দুমেলা (১৮৬৭) যে ঐতিহ্যের ভাবধারাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, স্বর্ণকামুরীর জীবন গড়ে উঠেছিল, সেই জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থী বাতাবরণে। প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ'-এ (১৮৭৬) পৃথ্বীরাজ মহিষী, রাজকন্যা ঊষাবতী, চাঁদ কবির স্ত্রী প্রভাবতী ও তার সখি শৈলবালার মধ্যে মহিমান্বিত আর্যনারীর প্রতিবিম্বিত করে দেশের অন্তোবাসী নারীসমাজকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী: "...স্বর্ণকুমারী চাইতেন যে স্বদেশের ললনাগণ প্রবল স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের তাড়নায় মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে আত্মবিসর্জন করুন।"[৬]

স্বদেশের হিতসাধনে স্বর্ণকুমারী সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। এক প্রবল স্বাদেশিক চেতনার আলোড়নের মধ্যে কেটেছিল তাঁর বাল্য ও কৈশোর:

> তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী কিংবা ভারতী পত্রিকার সম্পদকীয় মন্তব্যসমূহের মধ্যে এতদ্বিষয়ক একটি সতর্ক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত স্বদেশ ও স্বজাতির সমূহ মর্যাদা ও সম্মনের প্রাসাদকে তিনি চিরকাল রক্ষা করে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।[৭]

বিংশ শতাব্দীর সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রচিত তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের ('বিচিত্রা', ১৯২০), ('স্বপ্নবাণী', ১৯২১), ('মিলনরাত্রি', ১৯২৫)— নায়িকা জ্যোতির্ময়ী তাঁর উত্তরসূরি হয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। অনেকে এই চরিত্রে স্বর্ণকুমারীর ছোটো মেয়ে বাংলার 'জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিত সরলা দেবী চৌধুরাণীকে খুঁজে পেয়েছেন:

> জ্যোতির্ময়ীর স্বদেশহিতৈষণা পিতা অতুলেশ্বরের স্নেহানুকূল্যে প্রবর্ধিত হয়েছিল; হয়ত লেখিকা দুহিতা সরলার কথা এখানে চিন্তা করেছেন। হিরণ্ময়ী ও সরলা— বিশেষভাবে সরলা দেবী পরবর্তীকালে স্বাদেশিকতায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; জীবনের ঝরাপাতা

গ্রন্থে সরলা দেবী এ বিষয়ে পিতামাতার সস্নেহ প্রশ্রয় ও অনুমোদনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। জ্যোতির্ময়ীর চরিত্রটি সরলাদেবীর ছায়াশ্রিত; তাঁরই দেশানুরাগ, ব্যায়াম শিক্ষা, ব্যায়াম সমিতি স্থাপন প্রভৃতি কার্যাবলী জ্যোতির্ময়ীর কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কালে তেজস্বিতা ও মাধুর্য সরলা দেবীকে মহিমাময়ী লোকগাথায় পরিণত করে জ্যোতির্ময়ীর মধ্যেও তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।[৮]

'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে জানা যায় যে স্বর্ণকুমারী চাইতেন সরলা দেবীকে বিয়ে না দিয়ে দেশের কাজে নিয়োজিত করবেন:

> সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা এই দুই ধারার সমন্বয়ে বাংলার নারী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বারা নারীসমাজের উদ্বুদ্ধ হওয়ার পটভূমিকায় সামাজিক পশ্চাৎপদ অবস্থাতে সীমিতি সুযোগ পেয়েও আন্দোলনে এগিয়ে আসেন বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা। তাদের কেউ কেউ মানুষ হিসাবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এর পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তি ও প্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে তথা বৃটিশের শাসন শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার আন্দোলনে নারীসমাজকে যুক্ত করার বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীসমাজের বাস্তব সমস্যা এরা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীসমাজের শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশমাতার শৃঙ্খল মোচন প্রয়োজন। এটাই ছিল নারী আন্দোলনের সূচনাপর্বে নারীসমাজের শ্লোগান।[৯]

দেখা যায় যে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ী আজীবন অবিবাহিত থেকে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছে। জ্যোতির্ময়ীর প্রণয়ী শরৎকুমারও তাঁর স্বদেশব্রতের সহযোগী হয়েছে:

> পারস্পরিক চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে নয়, কর্ম যজ্ঞের বিপুল তরঙ্গে এই দুই ব্রতনিষ্ঠ যুবক-যুবতী তাদের সার্থকতার পথ খুঁজে নিয়েছে। সেদিনের সমাজে এই তো এক নতুন কালের মেয়ে— যার সামনে আছে শুধু কাজের আহ্বান, ব্যক্তিপ্রেমে পরিতৃপ্ত ভালবাসার ঘর বাঁধার চেয়েও যার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে স্বদেশ-আত্মার অনুসন্ধান, গৃহিণী হয়ে, সাধ্বী হয়ে, মা হয়ে নয়— ভিন্ন কোনো পরিপূর্ণতায় জীবন ভরে উঠেছে তার, ভূমিকা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সে 'মানুষ' অভিধার পথে।[১০]

'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' নামক প্রবন্ধে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর নারীবাদী অবস্থান সে-যুগের প্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসে জীবন ও স্নেহলতাকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। 'ত্রয়ী' ('বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি') উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীকে ব্যায়ামসমিতি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি গঠন করে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছেলেদের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়:

> ... সত্যিকারের নতুন কালের মেয়ে জ্যোতির্ময়ীকে গড়তে পারলেন তিনি বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে, সমাজের কোনো চাওয়া-পাওয়ার খাপে গড়া হয়নি তাঁর এই নায়িকা, নিজের শক্তিতে নতুন সমাজ গড়ে নেওয়াই তার স্বপ্ন; এই শেষ উপন্যাসত্রয়ে স্বর্ণকুমারী মেয়েদের সামর্থ্যের শীর্ষ ছুঁয়েছেন তাঁর কলমে।[১১]

সমাজে 'বিবাহ' শব্দটির ওপর মেয়েদের ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। আজও দাম্পত্য জীবনে শুধু মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে মেয়েরা জীবন কাটায়। মেয়েদেরও যে মন আছে, প্রতিবাদ করার অধিকার আছে এ কথা পিতৃতন্ত্রে নিষিদ্ধ। স্বর্ণকুমারী গভীর মনস্তত্বসম্মত দৃষ্টিতে মেয়েদের জীবন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। 'কাহাকে?' (১৮৯৮) উপন্যাসে মৃণালিনীর মধ্যে লেখিকার ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়: "... পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।"[১২] উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজ-পরিসরে বসে স্বর্ণকুমারী মেয়েদের সমানাধিকারের কথা চিন্তা করেছিলেন:

> ১৮৯৮ সালের শিক্ষাহীন অধিকারহীন বাংলাদেশের মেয়ের পক্ষে খুব সহজ ছিল না হয়তো মণির এ দাবি, কিন্তু সুশিক্ষিত সচেতন মেয়ের এই দাবি থেকেই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে অনাগত আধুনিকতার পদধ্বনি।[১৩]

জন্মসূত্রে স্বর্ণকুমারী সচেতন শিক্ষিত পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, যিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা ভেতর থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। বিয়ে হয়োছিল জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে, যিনি ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুগামী। এঁদের অনুপ্রেরণা স্বর্ণকুমারীর সৃষ্টিশীল কর্মজগতের সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

> A writer pattern of choice is a function of his personality. But personality is not in fact timeless and absolute. However it may appear to the individual consciousness. Talent and character may be innate; but the manner is which they develop, or fail to develop, depends on the writers interaction with his environment, on his relationship with other human beings.[১৪]

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার শরিক। সেজন্য দেখা যায় জনপ্রিয়তা লাভের জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখিকারা সামাজিক অচলায়তনের সঙ্গেই আপোস করে এসেছেন। 'কাহাকে?' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী একটি শিক্ষিত আধুনিক মেয়ের মনোজগৎকে আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেভাবে উন্মোচিত করেছেন, তাঁর পূর্বে এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়ন আর কোনো লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না: "যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী, আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে।"[১৫] অযৌক্তিকতা ও আবেগের বাইরে এনে স্বর্ণকুমারী নারীর ভাবনাকে বিচার করেছেন:

> ... কাল যে ছিলাম— আজ আর সে আমি নহি। ... কি করিয়া এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিকটতর একটা আনন্দ জন্মিল— এই যে,— সে ভ্রান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।[১৬]

স্বামী অথবা ভাবী স্বামীর অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক যখন কোনো নারীর জীবনে আসে তখন সে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক চাপে উনিশ শতকের নারীকে তা মেনে নিতে হত। স্বর্ণকুমারী উনিশ শতকের এক নারীর ভাবনায় নারীমনের চাহিদাকে চিন্তাশীলতাকে আরও এক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা ঘোষ লিখেছেন:

ভাবতে অবাক লাগে যে এসবই ঘটে গেছে বিশ শতকে পা দেওয়ার আগেই, যার কয়েক দশক পরেও অনুরূপা দেবী বা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মতো জনপ্রিয় নারী ঔপন্যাসিকদের কলমে শুনছি সনাতন প্রথা সংস্কারের জয়গান, দেখেছি নারীর জন্য নির্ধারিত ভূমিকা পালনের অনায়াস অনুবর্তন।[১৭]

অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী স্বর্ণকুমারী দেবী সে যুগে সচেতন মন নিয়ে নারী মুক্তির চিন্তা করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী বেড়ে উঠেছিলেন এমন একটি পরিবেশে, যেখানে লড়াই করে তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু মেয়েদের শোষণ তার কাছে অজানা ছিল না। মননে এবং চিন্তনে সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পিতৃগৃহ, শ্বশুরগৃহে শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মেয়েদের যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সে পরিচয় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র গল্প শোনানোর জন্য তিনি উপন্যাস রচনা করেননি। সমকালীন নারীর প্রতি সমাজের, সমাজ-অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের নির্যাতনের সংবাদ তাঁর অজানা ছিল না। ছিয়াত্তর বছরের জীবন পরিধিতে বিবাহিত নারীর যন্ত্রণা, বৈধব্যের পীড়ন ও লাঞ্ছনা, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মধ্যেকার নারীর প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মেয়েদের পরিসরহীন জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন স্বর্ণকুমারী। উপলব্ধি করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজনীয়তার কথা। এরই সঙ্গে উপন্যাসে মেয়েদের পিতৃসম্পত্তির অধিকার" ভোটের অধিকারের কথা (সাফ্রোজস্ট আন্দোলনের কথা) উল্লেখ করে তিনি পাঠকদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন:

... তাঁর উনিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে অবশ্য অনেক সময়েই ইচ্ছাপূরণের পথ নিয়েছে কাহিনীর পরিণতি, তবু উনিশ শতকের উপন্যাসেও যে তিনি তুলে এনেছিলেন বিধবার সমস্যা, শিক্ষিতা আধুনিকতা মেয়ের স্বনির্বাচিত পাত্রে বিবাহের বাসনা, তাঁর কালের পক্ষে কম ছিল না সেটাও। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসে এসে মেয়েদের জন্য সমাজ-নির্ধারিত সীমারেখাকে অনেকটাই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী, শেষ ত্রয়ী উপন্যাসটিতে তিনি গড়েছিলেন এমন এক মেয়েকে, সমাজবাঞ্ছিত ভালো মা আর ভালো স্ত্রীর কাঠামো যাকে ছুঁতেই পারে না।[১৮]

তবে যুগজীর্ণ সংস্কারধর্মী চিন্তার বশ্যতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। অনেক সময়ই তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ করা গেছে। উপন্যাসে বিধবা সমস্যা উত্থাপন করেও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে গেছেন। সময়ের প্রেক্ষিতে স্বামীভক্তি প্রসঙ্গটি স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে এসেছে। শক্তিময়ী ('ফুলের মালা', ১৮৯৫) কনক ('ছিন্নমুকুল') স্নেহলতা ('স্নেহলতা বা পালিতা') চরিত্রগুলির মধ্যে আত্মচেতনার জাগরণ দেখিয়েও তাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। আসলে উনিশ শতক ছিল আত্মদ্বন্দ্বের যুগ। সে সময়কার অনেক লেখকের রচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নতুন চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও প্রচলিত সমাজ-সংস্কার থেকে তারা মুক্ত হতে পারেননি। এই রক্ষণশীল সমাজের চাপকে অতিক্রম করা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই পুরুষ প্রধান জগতের সংকীর্ণ পরিসরে বাস করে স্বর্ণকুমারী তাঁর নারীভাবনায় যে স্বাতন্ত্র্য এনেছেন তা সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না:

উনিশ শতকের সমকালে নারীর স্বাধীন চিন্তা ও চেতনা বিষয়ক অভিজ্ঞানের প্রারম্ভ

হয়েছিল ঠিক কিন্তু তা বিপুলভাবে তখন ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েনি। স্বর্ণকুমারী দেবী সেই সময়কালেই নারীর সচেতনতামূলক দিকগুলি নিয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির নারী চরিত্রগুলিতে এরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়েছে তারা। সেই সময়ে সমাজে যা বহুল প্রচলিত ছিল না তা দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিতে নারীত্বের নির্মাণ ঘটিয়েছেন।[১৯]

অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ী স্বর্ণকুমারী এক খোলা মন নিয়ে নারী স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন। দেশ এবং জাতির অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, তাদের মর্যাদা রক্ষা, তারা পরাশ্রিতা না হয়ে যাতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে— এ কথা সে যুগের শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে একইভাবে চিন্তা করেছিলেন সমাজসচেতন এই লেখিকা। তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতে ছিল যুগের বাধাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা।

ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর সারস্বত সাধনা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেননি। আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বেও তাঁর রচনাসম্ভার পাঠকের নাগালের বাইরে ছিল। বর্তমান যুগে নারী প্রগতির জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে যে উদ্যম লক্ষ করা যায়, উনিশ শতকে বসে ঠিক সেভাবেই ভেবেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৩২, ৩ জুলাই) মন্মথনাথ ঘোষ 'স্বর্ণস্মৃতি'তে লিখেছিলেন:

> ইহা কঠোর সত্য এবং যে জীবন প্রায় ষাট বৎসরকাল বঙ্গসরস্বতীর অক্লান্ত সেবায় ধন্য হইয়াছে, যে জীবন নারীসমাজের উন্নতিকল্পে নীরবে ও নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এমনকি রাজনীতির সে ক্ষেত্রেও যে জীবন বিগতযুগের দেশনায়কগণের সহযোগিতা করিয়া বঙ্গললনাগণকে সর্বপ্রথম এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, যে জীবন সুদীর্ঘকাল দেশচর্যা ও সাহিত্যসেবায় সার্থক ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, সে জীবনের জন্য শোকপ্রকাশ কেন? মন মানে না, হৃদয় বুঝিতে চাহে না। সাহিত্যপ্রেমের সেই মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, প্রতিভার সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্ত্তি— যে মূর্ত্তির সম্মুখে থাকিলে কত অভিনব প্রেরণা লাভ করা সম্ভব হইত, কত নব উৎসাহে সুপ্ত হৃদয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিত, কত নূতন আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সেই বরদশ্রীর জীবনমূর্ত্তি যে চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? এ শোক প্রকাশের ভাষা কোথায়?[২০]

তার সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নানা ধরণের রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজকে আলো দেখাতে সাহায্য করেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত হয়ে বাংলা সাহিত্যজগতে নারীকে পুরুষ প্রাধান্যের মধ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন:

> ... টানাপোড়েন, দোলাচলবৃত্তিতার মধ্য দিয়েই স্বর্ণকুমারীর যাত্রাপথের বিস্তৃতি। আধুনিক অর্থে নারীবাদী রূপে তাকে হয়ত চিহ্নিত করা যাবে না, তবু উনিশ শতকের নারীর স্বাধীন চেতনা উন্মেষের ঋত্বিকরূপে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন অবিসংবাদিতভাবেই।[২১]

## সূত্র


১. অরূপ আচার্য (সম্পা.), 'একান্তর', ১৮ বর্ষ ২০০৮, কলকতা, পৃ. ১০৩।

২. পুলককুমার সরকার (সম্পা.), 'শুভশ্রী', বহরমপুর, ২০০৪-০৫, পৃ. ২৬।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', কলকাতা: দে'জ, ২০০৯, পৃ. ৭২৪।

৪. চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', কলকাতা: আনন্দ, ১৩৮৭ ব., পৃ. ৪৫।

৫. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংক.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন', কলকাতা: দে'জ, ২০০০, পৃ. ৫১৫।

৬. পশুপতি শাসমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য', কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৮ ব., পৃ. ৮১।

৭. তদেব।

৮. তদেব, পৃ. ২৬১।

৯. মালেকা বেগম, 'বাংলার নারী আন্দোলন', ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৬৮।

১০. সুদক্ষিণা ঘোষ, 'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা', কলকাতা: দে'জ, ২০০৮, পৃ. ৮৭।

১১. তদেব, পৃ. ৮৭।

১২. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'কাহাকে?', কলকাতা: দে'জ, ২০০২, পৃ. ৩৫।

১৩. তদেব, পৃ. ১২।

১৪. পূর্বাণী ঘোষ (সম্পা.), 'পুরবৈয়াঁ', কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬২।

১৫. স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত, ২০০২, পৃ. ৩৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৩২।

১৭. তদেব, পৃ. ১২।

১৮. সুদক্ষিণা ঘোষ, পূর্বোক্ত, ২০০৮, পৃ. ৪৬।

১৯. মিতা দাস পুরকায়স্থ (সম্পা.), 'দিগন্তিকা', শিলচর, পৃ. ২২।

২০. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংক.), পূর্বোক্ত, ২০০০, পৃ. ৫১১।

২১. পূর্বাণী ঘোষ, (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা: নাটমঞ্চে এক লেখকের জীবনদর্শনের বিবরণ

গোবর্ধন অধিকারী

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ বা আত্মকথা লিখেছিলেন। আত্মকথায় অবধারিতভাবে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে তারাশঙ্করের জীবনদর্শন এবং সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের সন্ধান কীভাবে লেখকের 'আত্মকথা'য় পাওয়া যাবে, তা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ আত্মকথা কেবলমাত্র স্মৃতিকথা নয়, তা ইতিহাসের আঁতুড়ঘরও বটে। সেই ইতিহাস বৃহৎ ইতিহাস নয়; রাজা-রাজড়ার ইতিহাস নয়, তা সামাজিক ইতিহাস।

একদিকে সামাজিক ইতিহাস এবং তাকে কেন্দ্র করে লেখকের গড়ে ওঠা জীবনদর্শনের সন্ধান করা এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। কংগ্রেসি রাজনীতি থেকে মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে তিনি কোন ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাও বর্তমান প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় আমাদের মূল লক্ষ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মকথা'য় ব্যক্তি তারাশঙ্কর এবং সমকাল কীভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখানো।

বীজশব্দ: আত্মকথা, জীবনজিজ্ঞাসা, ধাত্রীদেবতা, মার্কসবাদ, যুগান্তর, রবীন্দ্রনাথ, রামায়ণ, লাভপুর, স্মৃতিকথা ॥

---

**গোবর্ধন অধিকারী:** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা: নাটমঞ্চে এক লেখকের জীবনদর্শনের বিবরণ
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৫৪-৬৬

## স্মৃতিকথা না আত্মকথা

আমরা বর্তমান আলোচনায় স্মৃতিকথা এবং আত্মকথার মধ্যে একটা সীমারেখা নির্দেশ করতে চেয়েছি। স্মৃতিকথা হল অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার যেটুকু স্মৃতিতে সজীব থাকে তার লিপিবদ্ধ ইতিহাস। আত্মকথা হল অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব অভিমত বা অনুভূতির সংযুক্ত ইতিহাসের বিবরণ। সুতরাং স্মৃতিকথায় ব্যক্তিগত অনুভব থাকতে পারে নাও পারে, কিন্তু আত্মকথায় লেখক-ব্যক্তির নিজস্ব অভিমত জোরালোভাবে উপস্থিত থাকবে এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন।

আমরা এখানে মূলত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) জীবনীমূলক গ্রন্থগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তারাশঙ্কর প্রায় আটটি গ্রন্থে নিজের জীবন ও সমকালীন সময়কে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন।[৫৬] 'আমার কালের কথা', 'বিচিত্র', 'আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম পর্ব)', 'কৈশোর স্মৃতি', 'আমার সাহিত্য-জীবন (দ্বিতীয় পর্ব)', 'আমার কথা', 'মস্কোতে কয়েকদিন', 'চীনের ডায়রি'— গ্রন্থগুলোতে তিনি নিজ-জীবনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারাশঙ্করের লেখালেখির একটি বৈশিষ্ট্য হল পাঠককে সামনে বসিয়ে যেন তিনি তাঁর কাহিনি বুনে চলেছেন। জীবনীগ্রন্থগুলোতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি জীবনী লিখেছেন কথকতার ভঙ্গিতে। যেন সামনে কাউকে বসিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে চলেছেন তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা।

কালের ক্রম অনুযায়ী তাঁর 'আত্মকথা'র প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত গ্রন্থ 'আমার কালের কথা' (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থের সূচনাতেই লেখক 'পাশে যারা সঙ্গী সাথী জুটেছে', তাদের উদ্দেশ্য করে জীবনী লেখার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন:

> "তারা বললে— বলুন সেই কথা। আপনার কথা।
>
> — না। আমার কথা বলতে নেই ভাই।
>
> — না। বলুন।
>
> ...
>
> নিজের কাছে ছাড়া নিজের সুখের কথা, পুণ্যের কথা, কীর্তির কথা— এসব কথা বলতে নেই।... তাই আমার নিজের কথা বলব শুধু নিজেকে, নিজেই দাঁড়াব নিজের কাছে বিচারপ্রার্থীর মতো এবং বিচারকের মতো, সান্ত্বনা প্রার্থীর মতো সান্ত্বনা দাতার মতো। তবে—
>
> — তবে?
>
> — তবে হ্যাঁ, বলতে পারি কিছু কথা। বলতে পারি পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা।...
>
> — তাতেও কি আপনার কথা বলা হবে না? হাসল অনুজদের একজন।
>
> — না।
>
> — না?
>
> — হ্যাঁ ভাই, না।
>
> — কালের কথায় আপনি আসবেন না? আপনার কথা থাকবে না?

> — আসব। থাকবে। তবু সে আমার আসা হবে না, আমার বলা কথা হবে না।
>
> ...
>
> ক্ষীরের মধ্যে যতটুকু অধিকার, সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশী নয়।"[১]

জীবনের প্রথম স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে তারাশঙ্কর নিজেই এই বক্তব্য জানিয়েছেন। অর্থাৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থগুলো লিখতে শুরু করেছিলেন, যা আমাদের বিবেচনায় আত্মকথায় পরিণত হয়েছে। যেখানে সাল-তারিখ নিয়ে পরিসংখ্যানবিদের চোখ রাঙানি নেই, আবার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা মতবাদ প্রচার করার জন্যও তিনি কলম ধরেননি। নিজের ফেলে আসা কালকে পাঠকের সামনে কালের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ উপস্থিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিগত কালকে নতুন প্রজন্মের কাছে জ্ঞাত করার দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি জীবনী লেখার এই সংরূপকে অবলম্বন করেছিলেন। পুরোনো ও নতুন কালের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে তথ্য-পরিসংখ্যান নয়, ঘটনা দিয়ে বর্ণনা করে তিনি একাধিক আত্মকথামূলক গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। সুতরাং এই কাল চেতনা বা দুই কালের সন্ধিক্ষণের সংকটকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি তাঁর এই জীবনীধর্মী গ্রন্থগুলো। বিখ্যাত 'জলসাঘর' গল্প থেকে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তিনি এই কালের দ্বন্দ্বকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। আর এই কালের কথা বলতে গিয়ে বক্তা অর্থাৎ ব্যক্তির কথা কম-বেশি আসবেই। তারাশঙ্কর তা প্রথমেই স্বীকার করেছেন এবং কালকে তিনি নিজের জীবনবীক্ষা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থগুলোকে দেখা যায় এবং আমরা 'আত্মকথা' বলে দাবি করতে পারি।

## সামাজিক ইতিহাস বা আত্মানুসন্ধান

আমরা মনে করি তারাশঙ্করের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থগুলো ইতিহাস সচেতন যে কোনো পাঠকেরই অবশ্যপাঠ্য টেক্সট (text) হওয়া উচিত। উনিশ-বিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে গ্রন্থগুলো পড়া প্রয়োজন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এই ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— "সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।"[২] বাল্য-কৈশোরের লাভপুর ও সংলগ্ন গ্রামের নানা সামাজিক ইতিহাস, নানান প্রথা, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার তারাশঙ্করের লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাস তথাকথিত বৃহৎ ইতিহাস নয়, কিন্তু কোনো জাতিকে বুঝতে গেলে, কোনো সমাজকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বুঝতে গেলে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। একালের সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এই সকল উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধক উদ্ধারণ দত্ত বাবা থেকে মণিপুরের টিকেন্দ্রজিৎ মহাবীর, মানকরের বিখ্যাত কদমা, সিউড়ির মোরব্বা, মান্যুড়ে মুসলমান অর্থাৎ খুনে-ডাকাত মুসলমান, মামুদের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস, Deitz Lantern বা ডিট্জ হ্যারিকেন, স্বর্ণ ডাইনী, গ্রামের ফুল্লরা দেবী, মহামারী কলেরার প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়েকে তিনি কেবলমাত্র একটি গ্রন্থ 'আমার কালের কথা'য় তুলে ধরেছেন। 'জলসাঘর' গল্পের মূল যে সুর প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের দ্বন্দ্ব তার সন্ধান স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থগুলোতে টুকরো টুকরোভাবে ছড়িয়ে আছে। গল্প-উপন্যাসে যে দ্বন্দ্বকে তিনি বর্ণনা করেছেন,

সেই দ্বন্দ্ব একান্তই ছিল তাঁর নিজস্ব। কেবলমাত্র কাহিনির দাবিতে তিনি দ্বন্দ্ব তৈরি করেননি। তাঁর আত্মদ্বন্দ্বই গল্প-উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে। শুধু বিবৃতই হয়নি, একজন সত্যসন্ধানী মানুষের মতো, জীবনের মানে খুঁজে চলা সাধারণ মানুষের মতোই উত্তর খুঁজেছেন সারা জীবন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এ জীবন লইয়া কী করিব ? বা এই জীবন লইয়া কী করিতে হয়— এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর তারাশঙ্করও সন্ধান করতে চেয়েছেন। তিনি জীবনের রহস্যের মধ্যে বেদনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'আমার কথা', 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক লেখার প্রারম্ভিক সংখ্যায় তিনি এক জায়গায় নিজের ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন: "কিন্তু আমার একটা মন আছে— যে মন বেদনাকে খুঁজে বেড়ায় অথবা পৃথিবীর বেদনার চুম্বকের আকর্ষণে লোহার মতো আকৃষ্ট হয়ে ছোটে তার স্পর্শ নিতে, স্পর্শ পেতে।... আমি এই পৃথিবীর প্রাণময় আনন্দলোকের অন্তঃস্থলে একটি অতি তীব্র বেগবতী বেদনার প্রবাহকে যেন স্পষ্ট অনুভব করি।... যা চাই, যাকে চাই তা অন্নে নেই, বস্ত্রে নেই, প্রতিষ্ঠায় নেই, হয়তো বা জীবনে যাদের পরমধন ভাবি, তাদের মধ্যেও নেই। সে আছে ওই বিরহের উৎসের কেন্দ্রে, বা বিরহের মধ্যেই তার স্থিতি।"[৩] এই অংশের ভাষা আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র ভাষা এবং দৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়। যাই হোক ব্যক্তি তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে যে রহস্যের সন্ধান করেছেন, নিজের জীবনেও সেই উত্তর খুঁজেছেন। সে কারণেই একসময় বাড়িতে কাউকে না জানিয়েই মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের গজেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষের সহায়তায় হঠাৎ করেই কাশী চলে যান। তাঁর অনুরোধে গজেন্দ্রনাথ এবং সুমথনাথ বালিশ-কম্বল-কাপড়-পাঞ্জাবি এবং একটি সুটকেস কিনে দেন। সেই সঙ্গে কিছু টাকা ধার নিয়ে বাড়িতে পরে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে বিকেলের ট্রেনে কাশী যাত্রা করেন। কেন তাঁর এই কাশী যাত্রা ! 'আমার কথা'য় তিনি জানিয়েছেন "মন তখন এত অধীর এত চঞ্চল, এত তৃষ্ণার্ত যে কোথায় আমার জীবনের প্রশ্নের উত্তর, কোথায় কিসে আমার তৃপ্তি..." — এই উত্তর খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে উত্তর খুঁজেছেন। নিজের ব্যক্তিজীবনে যা অনুভব করেছেন, তাই-ই সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। কবি যতই বলুন কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে অন্তত তা প্রযোজ্য নয়। তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলোই তাঁর সাহিত্য রচনার চরিত্রশালা। এগুলোই তাঁর সাহিত্যের আঁতুড় ঘর। জীবনকে যেমন দেখেছেন, তেমন করেই সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। এতটুকু এদিক-ওদিক করেননি। কারণ সমাজই আসল রঙ্গমঞ্চ; শেক্সপিয়র বহুকাল আগেই 'As You Like It' নাটকে বলেছিলেন: "All the world's a stage, And all the men and women merely players।" তারাশঙ্কর কাশী গিয়েও তাঁর প্রত্যাশিত পথের সন্ধান পাননি। পরে মুর্শিদাবাদের কান্দির রাজবাড়ির বিগ্রহের কাছে গিয়ে শান্তি পেয়েছিলেন আকস্মিক এবং অলৌকিকভাবে। 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল এই জীবনের মানে খোঁজার জন্যই তো আপাতভাবে উদ্দেশ্যহীন স্থানান্তরে গমন করেছে।

সুতরাং তারাশঙ্কর নিজের জীবনে যা অনুভব করেছেন, যে জীবনদর্শনে স্থিত হতে চেয়েছেন; যেমন তিনি আত্মকথামূলক গ্রন্থগুলোতে বলেছেন, তাকেই সাহিত্যের পাতায় স্থান দিয়েছেন। কাশী থেকে কান্দি মনের শান্তির খোঁজে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা বা দিনের পর দিন কলম থামিয়ে বাড়িতে বসে থাকা সবটাই মানুষ তারাশঙ্করের আত্মিক ঘটনা। সেখানে এতটুকু খাদ নেই। কবি জীবনানন্দ দাশ কথিত 'মুখ' আর 'মুখোশ' তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনে বা ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে দুই রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেকালে এসব ঘটনা খুবই সত্য। একালে ডিজিটাল বিপ্লবের দিনে মনের শান্তির খোঁজে কাশী থেকে কান্দি বা

দীক্ষা নেওয়ার জন্য আকুলতা তা অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু সেকালে এরকম ঘটনা ছিল স্বাভাবিক। সেকালের কাশীতে গিয়ে অনাহূত যে কেউ জামাই আদরে আশ্রয় পেতেন। তাই কাশীর ডাক্তার মৈত্র থেকে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ওরফে বাংলা সাহিত্যের আনন্দসুন্দর ঠাকুর সকলেই তারাশঙ্করের মনের অস্থিরতা বা 'অনন্ত দুঃখ' নিবারণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই সবের মধ্য দিয়েই সেকাল আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। এসব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না। ১৭ মার্চ ২০২৪-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়'তে পুঙ্খানুক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে 'বারাণসীর বাঙালিরা' শিরোনামে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং কালের নিয়মেই সেই কাশী আর নেই। কিন্তু এরকম বিভিন্ন স্মৃতিকথামূলক রচনায়, ডায়েরিতে আপাত গুরুত্বহীন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখে সেকালের কাশী ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে সজীব হয়ে থাকবে। 'বিচিত্র' গ্রন্থে তারাশঙ্কর যেসব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তা অবাস্তব এবং অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থে উল্লেখ করা সব ঘটনাই সত্য। 'বিচিত্র' গ্রন্থটি শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'চিত্রা' কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে/ তুমি বিচিত্ররূপিণী'। এর পরেই তিনি বলেছেন, 'মানুষের জীবনে এই বিচিত্রের একটি অনুসন্ধান বোধ করি তার জীবনধর্ম'। গ্রামের নেতাকে ভুলোয় ধরা, ফুল্লরাতলায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ এবং তার পরবর্তী ঘটনা, কিশোর দুলাল কীভাবে তার পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল এবং বিমাতাকে আক্রমণ করেছিল ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনা; যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না, তারাশঙ্কর তা এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এরকম কিছু ঘটনা ঘটে, যার কার্যকারণ বুঝে ওঠা যায় না। এসব সত্য হলেও, মানুষের জীবন-মরণের নিয়ন্ত্রক হলেও ইতিহাস এসব বিষয়ে নীরবই থাকে। এই সামাজিক ইতিহাস এবং তা থেকে আত্মানুসন্ধানের বীজ তারাশঙ্করের আত্মকথাধর্মী এই রচনাগুলোতে পাওয়া যায়।

## মার্কসবাদ ও তারাশঙ্কর

আত্মকথার গ্রন্থগুলোতে ব্যক্তি তারাশঙ্করের জীবনকথা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেকালকে প্রত্যক্ষ উদাহরণ সহ পেয়ে যাই। কেবলমাত্র ইতিহাস নয়, তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও লেখক দিয়েছেন। একটা সময় কমিউনিস্ট দলগুলোর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনে যুক্তও হয়েছিলেন। আসলে সাম্যবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু সে মোহ তাঁর বেশিদিন থাকেনি। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের রাজনীতি নিয়ে তাঁর মোহভঙ্গ যেমন ঘটেছিল, ঠিক তেমনই প্রগতি লেখক সঙেঘ যুক্ত হয়ে তিনি আরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। বামপন্থী দলগুলোর দলীয় আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্য সৃজনের বিষয়টি তারাশঙ্কর মেনে নিতে পারেননি। কেবলমাত্র তারাশঙ্কর নন, সেকালের অনেকেই এই সাংস্কৃতিক শাখায় দলীয় নির্দেশ মেনে চলতে পারেননি। তাই গণনাট্য থেকে নবনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। 'মস্কোতে কয়েকদিন' এবং 'চীনের ডায়েরি'তে তাঁর কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ধ্যানধারণা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে মস্কো গিয়েছিলেন এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভায় যোগ দিতে। সেখানেও তারাশঙ্কর কমিউনিস্ট রাশিয়ার সম্মেলন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে আহত হন এবং দ্রুত দেশে ফিরে আসেন। এই মনের কথা তিনি গোপন করেননি, আবার সরাসরি কাউকে আক্রমণও করেননি। আত্মকথামূলক গ্রন্থগুলোতে তিনি কাউকে আক্রমণ করবেন না বা কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবেন না বলেই ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা,

তাঁর জীবনাদর্শ তাঁকে কারও প্রতি সুযোগ বুঝে আক্রমণে নিরস্ত করেছে। কিন্তু দুঃখ পেয়েছেন জীবনে প্রচুর। লেখক-রাজনীতিবিদ অনেকেই তাঁকে আহত করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর সরাসরি প্রত্যুত্তর দেননি।

মার্কসবাদীদের সমালোচনা করতে গিয়ে 'আমার কথা'য় তিনি এক ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপকের একটি লেখার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কিন্তু কোথাও ওই অধ্যাপকের নাম-ধাম কিছুই বললেন না, বা তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণও করেননি। জনৈক অধ্যাপক একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন "বাল্মীকি আশ্চর্যভাবে মধুসূদন অপেক্ষা অধিকতর মার্কসবাদী" এবং অরণ্যকাণ্ডে রাবণ "সীতাকে ধর্ষণ অর্থাৎ দেহগতভাবে তাকে ভোগ করেছিলেন।" তারাশঙ্কর জনৈক অধ্যাপককে তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে চিঠি পর্যন্তও দিয়েছিলেন: "তাঁকে এ সম্পর্কে চিঠি লিখেছিলাম।" তিনি খুব সপ্রতিভ অহঙ্কারে উত্তরও দিয়েছিলেন: "অভিনব সত্যকে সহস্র সহস্র বৎসর পরে আবিষ্কার করার গৌরবে"। তারাশঙ্কর সত্য কী, তা জানার জন্য রামায়ণ খুলে 'ধর্ষণ' শব্দটি যতবার এসেছে খুঁজে বার করেন। মোট ১২৭ বার শব্দটি রামায়ণে এসেছে। সব ক্ষেত্রেই 'জোরপূর্বক বিপর্যস্ত বা লাঞ্ছিত করা' বোঝানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কোন অধ্যাপক সীতাকে নিয়ে কী লিখেছেন, তা নিয়ে তাঁর এত গাত্রদাহ হবার কারণ কী? তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> আজ এই ব্যাখ্যা বিশদ করে দেওয়ার কারণ সমস্ত ঘটনাটিকে পরিষ্কার করে সামনে ধরা। এর মধ্যেই বুঝতে পারবেন পাঠক যে কী কৌশলে, কী সামান্যতম একটি 'শব্দে'র অপব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিকৃতরূপে তুলে ধরে নতুন যুগের মানুষের কাছে ভারতীয় আদর্শগুলির মূল্য ম্লান করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন এঁরা।[৪]

অর্থাৎ দেশ এবং সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি এত পরিশ্রম করে এই উত্তর অনুসন্ধান করেছিলেন। একালের কতজন লেখক-বুদ্ধিজীবী এই পরিশ্রম করবেন বা কতজন এই স্বযাচিত দায়বদ্ধতা বোধ করবেন সে বিষয়ে আমাদের গভীর গভীর সন্দেহ রয়েছে। আসলে তারাশঙ্করের নিজের দেশ সম্বন্ধে, নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে উচ্চস্তরের ধারণা ছিল। যে ধারণা বই পড়ে নয়; দেশকে, দেশের মানুষকে জানার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় ছিল। 'ডাইনী' গল্পের স্বর্ণ ডাইনি তাঁর চোখে দেখা। বিদেশি বই পড়ে তিনি ডাইনি তৈরি করেননি। 'রাধা' উপন্যাসের নেড়া-নেড়ি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গল্প তাঁর চোখে দেখা ঘটনার প্রতিফলন। 'রসকলি', 'রাইকমল' গল্পের বৈষ্ণবী বেলেড়ার কমলিনীকে দেখেই লেখা।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয়, তখন চারিদিকে প্রশংসিত হয়। মার্কসবাদীরাও এর প্রশংসা করেন। এমনকী চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে উপন্যাসটি অনুবাদ করার প্রস্তাব দিয়ে চিঠিও দেওয়া হয়। বোঝা যায় সবটাই এ দেশের মার্কসবাদীদের সঙ্গে চেক দেশের মার্কসবাদীদের যোগাযোগের ফলেই এই প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হাওয়া বদলে যায়, যখন তারাশঙ্কর মার্কসবাদীদের প্রতি বিভিন্ন কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দূরত্ব তৈরি করেন। ফলে চেক ভাষায় আর অনুবাদ হয়নি। জনৈক সাহিত্যিক-অধ্যাপক যিনি কিছুদিন আগেই উপন্যাসটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, সেই তিনিই আবার এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকায় প্রশংসামূলক সমালোচনা লেখার পর, মার্কসবাদীদের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক ছিন্ন হলে তিনিই আবার উপন্যাসটির কঠোর সমালোচনা করে লিখলেন:

"লেখক উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে রাগে ফেটে পড়লেন না কেন?" তিনি বুঝেছিলেন, "কম্যুনিস্ট-দলভুক্ত সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্যিকের চেয়ে দল বড়ো।" ফলত আর্টের বিচার সেখানে উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু সব জেনেও তারাশঙ্কর কারও বিরুদ্ধে কোনো কটূ কথা বলেননি। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্পষ্ট:

> ব্যঙ্গ বা শ্লেষাত্মক রসিকতা করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। সে আমি কখনও করি না, এবং গালিগালাজ বা দোষারোপ করাও আমার ধর্মবিরুদ্ধ। আমি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করবার অভিপ্রায়ে বা কম্যুনিস্ট-দলভুক্ত সাহিত্যিকদের হেয় প্রতিপন্ন করে প্রকারান্তরে গালিগালাজ দেবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি।[৫]

অন্তত কেউ দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করতে পারবেন না।

## আত্মদগ্ধতাই আত্মরক্ষার নিরপেক্ষ অস্ত্র

তারাশঙ্করের লেখা 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত রূপ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। বাংলার মাহিষ্য সম্প্রদায় ও কৈবর্তদের নিয়ে কিছু কথা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। লেখককে আক্রান্ত হতে হয়। ১৯৪৯ সালের ১০ এপ্রিল (১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ২৭ চৈত্র) ৬১ হাওড়া ব্যায়াম সঙেঘর একটি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় তারাশঙ্কর আক্রান্ত হন। তাঁর গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়, মুখে ঘুষি মারা হয় কয়েকবার। শক্ত কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। রক্তাক্ত তারাশঙ্কর বাড়িতে এসে দেখলেন গাড়ির মধ্যে একপাটি জুতো এবং একখানা ইট। কিন্তু কোথাও কোনো অভিযোগ করেননি। তিনি মনে করেছিলেন নিজের অজ্ঞাতেই এক সম্প্রদায়ের মানুষকে আঘাত করেছেন। যদিও 'সন্দীপন পাঠশালা'র নায়ক ও মাহিষ্য সম্প্রদায় একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি যে হাওড়ার অনুষ্ঠানে গেলে আক্রান্ত হতে পারেন, তা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন। কারণ কয়েকদিন ধরেই সংবাদপত্রে 'সন্দীপন পাঠশালা'র বিরোধিতা করে চিঠি প্রকাশিত হচ্ছিল। অনেকে বাড়িতেও চিঠি পাঠিয়েছিল। এসব জানা সত্ত্বেও 'ভয়কে প্রশ্রয়' না দিয়ে সভায় গিয়েছিলেন। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে মামলাও করেছিল। কিন্তু অভিযুক্তদের তিনি চিনতে পেরেও অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল: "এরা তো কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের আক্রোশে আমাকে আক্রমণ করেনি! এরা তো কম ভালো আমাকে বাসত না! আমি নিশ্চয়ই এদের মর্মে আঘাত দিয়েছি। এ তারই প্রত্যাঘাত।"[৬] সুতরাং লেখক আক্রান্ত হতে পারেন জেনেও সভায় যেতে পিছপা হননি। নিজেকে ভীরু প্রমাণ করতে চাননি। সমস্যা থেকে পালিয়ে যেতে চাননি। কেবল তাই নয় মারমুখী জনতার মাঝে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাদের কথা শুনতে চেয়েছিলেন সব কিছু জেনেও। গাড়িতে বসে থাকা 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে নিষেধ করেন। নাহলে তিনি উন্মত্ত জনতার মাঝে গিয়ে আরও বিপদে পড়তেন। পুলিশের সামনে দোষীদের চিনতে পেরেও অস্বীকার করেন। একজন লেখকের এই সহনশীলতা এবং দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরকে বুঝে তাদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত না হওয়ার এই দর্শন আমাদের কাছে বিশেষভাবে শিক্ষণীয়।

আমরা একালের বিখ্যাত লেখকদের দেখেছি অর্থ উপার্জনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাণিজ্যিক কাগজের জন্য কলম ধরতে। অনেকে বিজ্ঞাপনের জগতেও পা বাড়িয়েছেন। এ সম্বন্ধে সব থেকে বেশি অভিযুক্ত লেখক সম্ভবত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা পাঠককে অপাঠ্য জিনিসও পড়িয়ে নিয়ে তবে রেহাই দিত। কিন্তু ভোগ-বিলাস থেকে শত হস্ত দূরে থেকেও সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ

উপার্জনের জন্য কাগজের অফিসে চাকুরি নিতে হয়েছে। তাঁর বাড়িতে তখন অনেকগুলি মানবসন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল। জামাতা শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর তার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব তারাশঙ্করকেই নিতে হয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'যুগান্তর' পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কারণ, "... আজ নতুন করে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজছি, কারণ আমার মেয়ের সংসার— তিনটি মেয়ে একটি ছেলেকে মানুষ করতে হবে আমাকে।"[৭] অর্থ উপার্জনের জন্য এই লেখা বিষয়ে নিজের সম্বন্ধে নিজেরই অতৃপ্তি ছিল তাও বলেছেন:

> 'যুগান্তরে' চাকরি নিয়ে আজও সেই একটি কাজই করে চলেছি। নাতিনাতনীদের মানুষ করে চলেছি। বড়ো কিছু বৃহৎ কিছু করতে পারিনি, করবার অবকাশ পাইনি। সময় নেই। আজও বোধ করি, (বোধকরি নয়, নিশ্চিতভাবে) বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে আমাকেই সব থেকে বেশী লিখতে হয়। সে সব রচনা সাময়িকপত্রে কলেবরই পুষ্ট করে, তার থেকে বেশী কিছু হয়ে উঠতে পায় না, পারে না। সময়ও পাই নে হয়তো বা শক্তিও ক্ষয় হয়ে এসেছে।[৮]

একজন লেখক নিজের লেখা সম্বন্ধে, লেখার মান সম্বন্ধে এতটা সচেতন হলে তাঁকে বাহবা দিতেই হয়। নিজের লেখা সম্বন্ধে নিজের এই খেদ বা আত্মসচেতনতা যে কোনো বড়ো মাপের লেখকের গুরুত্বপূর্ণ একটি চারিত্রিক উপাদান। যে সময় তারাশঙ্কর 'যুগান্তরে' কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই সময়ে তিনি খ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছেন। ভারত তথা বাঙালি পাঠকের মনে ততদিনে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় চাকরি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ইত্যাদি তিনি পেয়ে গেছেন। দীর্ঘদিনের লেখক-জীবনও অতিবাহিত করে ফেলেছিলেন। সুতরাং সংবাদপত্রে কলাম লেখার গুণগতমান সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা ছিল স্বভাবজাত এবং আত্মসচেতনতার প্রমাণ। কিন্তু সেদিন 'যুগান্তরে' চাকরি গ্রহণ করেছিলেন বলেই আমরা 'গ্রামের কথা' নামে তাঁর দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতার সংকলন পেয়েছি। অধ্যাপক অভ্র ঘোষের সম্পাদনায় সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ-দেশ-কাল ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় গ্রন্থটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবার দাবি রাখে। সেই সঙ্গে তারাশঙ্করের মতো একজন নির্ভেজাল সাহিত্যিক যে গভীর চিন্তনমূলক প্রবন্ধও লিখতে পারেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আর সব মিলিয়ে বলা যায় তারাশঙ্কর কেবলমাত্র লেখার জন্য গল্প-উপন্যাস বা কোনো কিছুই লেখেননি। সবকিছু নিয়েই তাঁর গভীর চিন্তা-ভাবনা ছিল। যা তাঁর ছোটোগল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এই ফিচারধর্মী প্রবন্ধগুলোতেও ছাপ রেখেছে। দেশ-কাল-সমাজ ইত্যাদি সব বিষয়েই তাঁর নির্দিষ্ট দর্শন ও ভাবনা সবসময়ই সক্রিয় ছিল।

'যুগান্তরে' চাকরি করা নিয়ে লেখককে অনেক নিন্দা-মন্দ সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি নীরবে সব সহ্য করে গেছেন বাইরের লোকের সমালোচনা:

> আমাকে ফাটিয়ে চুরমার করতে চেয়েছে। সারাটা জীবনে এই নীরবে প্রহার সহ্য করা সত্য, আমার জীবনসত্যের একদিক। আমি আঘাত সয়েই গেলাম। তার প্রতিশোধে কাউকে আঘাত ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করিনি। স্বনামে বেনামে এ কাজ আমি করিনি। এইটে আমার জীবনের একটা সান্ত্বনা।... মানুষকে গালাগাল দিয়ে যে একটি প্রমত্ত-

> রস উপভোগ করা যায় সে রসাস্বাদন আমার আত্মা ও মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এবং উগ্রতাহেতু অসহনীয়।[৯]

জীবনে বহু আঘাত নীরবে সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনো উগ্র জবাব দেননি কাউকে। বামপন্থীদের কাছে বারবার অপমানিত বা আঘাত পেলেও কখনো প্রত্যাঘাত করেননি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অফিসে 'কুইসলিং' অর্থাৎ দেশদ্রোহী কটূক্তি করা হলে প্রতিবাদ করেন এবং ১৯৪৫ সালে সঙ্ঘের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু সবকিছুই তিনি তাঁর মার্জিত ভাষায় করেছেন। তিনি কারও উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেননি। যখন তাঁকে রাজ্যসভার সভ্য হিসেবে ১৯৬০ সালে মনোনীত করা হয়, তখন তাঁকে তীব্র সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু নীরবে তিনি তা সহ্য করে গেছেন। কারণ তাঁর কাছে নিন্দুকদের সমালোচনার তুলনায় দেশের হয়ে কাজ করতে পারাটা ছিল অনেক বড়ো ব্যাপার। অসম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলেজ স্ট্রিটের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উত্তেজনাপূর্ণ সভা হলে তারাশঙ্কর নিজ উদ্যোগে তা শান্ত করেন। এ নিয়েও তাঁকে সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন ওই সভায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তার ফলাফল হবে ভয়াবহ। যার পরিণামে বাঙালি বিভিন্ন রাজ্যে আরও মার খাবে, আবারও বিতাড়িত হবে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি কখনো সমর্থন করেননি। পরে নিন্দুকরাই নিজেদের এ বিষয়ে ভুল বুঝতে পেরে তারাশঙ্করের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়েছিলেন।

একটা সময় তাঁকে এ-ও শুনতে হয়েছিল: "উনি আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?" অর্থাৎ তারাশঙ্কর নবাগত লেখকদের পথ ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? কোনো লেখক কি জোর করে অন্য লেখকের পথ আটকে রাখতে পারে! এই একই অভিযোগ উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'আবিষ্কার' কবিতায় লিখেছিলেন: "সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর।" অর্থাৎ ত্রিশের দশকের কবিরাও একই অভিযোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি। তারাশঙ্কর নবাগত লেখকদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন শুনে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে মর্মাহত হয়ে অভিযোগ করেছিলেন: "আমাকে কি মরতে বল তোমরা?" ব্যাস এইটুকুই। নিজে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সেই জ্বালা বিষের আকারে বাইরে উদ্গীরণ করেননি। অর্থাৎ যেখানে তিনি আহত হয়েছেন বা অপমানিত হয়েছেন বা দুঃখ পেয়েছেন; সেখান থেকে নীরবে সরে গেছেন। কোনোরকম বাদানুবাদে জড়াননি বা কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলেননি। তবে হ্যাঁ এটাও ঠিক, যা ন্যায় সঙ্গত বা নীতি সঙ্গত তা বলেছেন বা তাঁর কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে সরে এসেছেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বীরভূমের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোটে কংগ্রেস থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন লাভপুরেরই কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। বিপরীত পক্ষে তারাশঙ্করেরই এক আত্মীয় ছিলেন প্রার্থী। তারাশঙ্কর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ভোটের ঠিক আগে দুই প্রার্থীর মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায়। তারপর বিপক্ষের প্রার্থীর বাড়িতে কালীকিঙ্করবাবুর অনুরোধে সিউড়ি থেকে কোর্টের কাজ মিটিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। কিন্তু খেতে বসার পর বিপক্ষের প্রার্থীর ছেলে তারাশঙ্করকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন: "... জানো অমুকে কি বলছিল? বলছিল, তোমাদের সঙ্গে ইলেকশনে বিরোধিতা করে তোমাদের বাড়িতেই খেতে এল? লজ্জা হল না?" এতে তীব্র অপমানিত তারাশঙ্করের প্রতিক্রিয়া: "আমি ভাতের গ্রাসটি নামিয়ে হেসে তাঁকে বললাম, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লজ্জাহীনতার যে কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তা থেকে তুমি আমাকে নিবৃত্ত করেছ। আমাকে তুমি রক্ষা করেছ।"[১০] ব্যাস, এটুকুই তাঁর প্রতিবাদ। এতেই যা কাজ হবার সেদিন হয়েছিল। রাগ-ঝগড়া, গালি-

গালাজ, দেখে নেবার হুমকি ইত্যাদি কিছুই তিনি করেননি। এত বড়ো সংযম এবং সহনশীলতা যে কোনো মানুষের চরিত্রের একটি দুর্লভ গুণ। যা তারাশঙ্করের ছিল অনায়াস আয়ত্ত।

## লাভপুর: সমস্ত জীবনের যিনি ধাত্রী তিনিই ধরিত্রী

বীরভূমের লাভপুরের মাটির অবদান তারাশঙ্করের জীবনে অনস্বীকার্য। খুব ছোটো থেকেই লাভপুর গ্রামের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রামের অনেকের সক্রিয় যোগাযোগ তাঁর মানসিক গঠন নির্মাণে সহায়তা করেছিল। নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ তো এই লাভপুরের কারণেই। 'রাতকানা' প্রহসনের জন্য বিখ্যাত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে দেখেই তো তিনি নাট্যকার হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। লাভপুরের বিশিষ্টজনদের কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যোগ তাঁকে কংগ্রেসী রাজনীতির প্রতি আগ্রহী করে তোলে। গ্রামের জন্য ডিসট্রিক্ট বোর্ডের হয়ে কাজ করেন অল্প বয়স থেকেই। কিশোর বয়সেই গ্রামে আগুন লাগা বা কলেরায় সেবা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে কাজে লেগে পড়েছিলেন। এইসব সমাজ হিতকারী উপাদান বাল্য-কৈশোরেই যাঁর চেতনায় সদর্থকভাবে প্রবেশ করে গেছে, তিনি সারা জীবন দেশ, দেশের মানুষ, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে ভাববেন এটাই তো স্বাভাবিক। আর এইসব বীজ রোপিত হয়েছিল লাভপুরের কারণেই। পারিবারিক ঐতিহ্য খুব একটা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। মা প্রভাবতী দেবীর অবদান তাঁর জীবনে অবশ্যই ছিল। তাই সম্পত্তি বাপের নয় দাপের; এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে বিনোবা ভাবের 'ভূ-দান' আন্দোলনের সময় নিজের জমিদারি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি দান করেন এবং এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোনো অর্থ সরকারের থেকে গ্রহণ করেননি। পিসিমা শৈলজা দেবীর জমিদারি সুলভ মানসিকতা গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে মায়ের সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন দৃঢ় মানসিকতার কাছে। অস্থির তারাশঙ্কর একসময় নিজের মায়ের কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র তারাশঙ্করকে তাঁর ঠাকুরদা দীনদয়ালের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ উকিল হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কারণ হরিদাস কর্মজীবনে ছিলেন ব্যর্থ পুরুষ। তারাশঙ্কর পিতার অকাল মৃত্যুতে পাটনায় বড়ো হওয়া মায়ের চেতনায় সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ সেবা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। জমিদারি সুলভ মন ও মানসিকতা অর্জন করতে পারেননি। তার ফলেই আমরা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছি।

লাভপুর তাঁর মধ্যে যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আবেগ তৈরি করেছিল, ঠিক একই ভাবে দেশসেবার মাধ্যমে সমাজসেবার বীজও রোপণ করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনাও লাভ করেছিলেন শৈশবের লাভপুর থেকে। তাঁর জন্মভূমিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর ধাত্রীদেবতা: "সমস্ত জীবনের যিনি ধাত্রী তিনিই ধরিত্রী; জাতির কাছে তিনিই দেশ; মানুষের কাছে তিনিই তো বাস্তু। তোমাকে চিনেই তো চিনেছি দেশকে; দেশকে চিনেই তো চিনেছি ধরিত্রীকে।" আমাদের মতে জন্মভূমি লাভপুরই তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা; বাস্তবত এবং চেতনাগত বা ভাবনাগত বা আইডিয়া— সবটাই হল লাভপুর। মা এবং পিসিমা সেই ধাত্রীদেবতাকে অনুঘটক হিসেবে পুষ্ট করেছেন। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে প্রায় মিথ হয়ে যাওয়া যে কথাগুলো তিনি বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যিক জীবনের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। লাভপুরকে চিনেই তিনি দেশকে চিনেছেন। সমগ্র দেশ ঘুরে তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু লাভপুর এবং লাভপুর সংলগ্ন অঞ্চলে যা দেখেছিলেন, যা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার মাধ্যমেই তিনি সমগ্র দেশকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই সূত্রেই অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁকে 'ভারতশিল্পী'

বলে অভিহিত করেন। এরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি যুক্তি দিয়েছেন "বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতিই তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের নর-নারীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় নর-নারীর কথাই বলেছেন।"[১১] আমরাও এই বক্তব্যে সহমত পোষণ করে বলব তারাশঙ্কর ব্যক্তিজীবনে ভাবনার জগতে এবং সাহিত্যিক হিসেবে প্রকৃত অর্থেই তিনি একজন 'ভারতশিল্পী' বা সমগ্র ভারতের একজন সচেতন আত্মা। তাই তিনি অসম আন্দোলন নিয়ে কেবলমাত্র বাঙালির কথা ভাবেননি, অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসী এবং সম্প্রদায়ের কথাও ভেবেছিলেন। বিধান পরিষদ থেকে রাজ্যসভা— উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাসখন্দে লেখক-শিল্পী সঙেঘর সভায় গিয়ে সমগ্র ভারতের কথা ভেবে কমিউনিস্ট শাসিত কোনো দেশের গোষ্ঠীভুক্ত যাতে না হতে হয়, একক প্রচেষ্টায় সাহিত্য অকাদেমির ওপর সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলে সভা ত্যাগ করেন। বিদেশের মাটিতে জওহরলাল নেহরুর জোটনিরপেক্ষ ভারতের সম্মান রক্ষা করেছিলেন এভাবে। প্রকৃত অর্থেই তিনি ভারতাত্মার বিবেক হিসেবে তাঁর কলম ধরেছিলেন। 'গ্রামের কথা' বা 'দেশের কথা' এবং 'ভারতবর্ষ ও চীন' ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থগুলোও তাঁর ভারত বিষয়ক ভাবনারই ফসল। 'আত্মকথা'র রচনাগুলোতেও তারাশঙ্করের ভারতাত্মার ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা বলা যায়। তিনি কম লিখেছেন, কিন্তু একটা 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' থেকেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সমগ্র ভারতের কথাই তিনি বলতে এসেছিলেন। এ বিষয়ে তারাশঙ্কর এবং সতীনাথ ভাদুড়ী একই পথের যাত্রী ছিলেন।

## জীবনযুদ্ধ

জমিদারির মোহ ত্যাগ করে সাহিত্যিক হবার স্বনির্বাচিত পথে যখন পা বাড়িয়েছিলেন, তখনই দুর্ভাগ্য তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল। কলকাতার মনোহরপুকুর রোডে রাস্তায় টিনের চালের ছাউনি দেওয়া ভাড়া ঘরে বসবাস করেছেন সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও রাস্তার কলে স্নান করেছেন। লেখার টেবিল বলতে ছিল একটা স্যুটকেস। এরপর এখান থেকে গেছেন বউবাজারের মেসে, তারপর শিয়ালদার কাছে শান্তিভবন বোর্ডিঙে। পেট ভরাতে চায়ের পর চা পান করেছেন। স্ত্রী উমার গহনা পর্যন্ত বন্দক দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু লড়াই করে গেছেন— সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জামাইকে অর্থ উপার্জনের উপযোগী করে তুলতে কয়লাখনিতে কাজ শিখতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। মনের দিক থেকে এই কাজে সমর্থন ছিল না। কিন্তু এই কয়লাখনির জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা কাজে লাগিয়েছিলেন সাহিত্যের কারবারে। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস এবং 'ঘাসের ফুল', 'খাজাঞ্চীবাবু' ইত্যাদি গল্পে কয়লাকুঠির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

১৯৩৮ সাল নাগাদ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে বম্বে টকিজের হিমাংশু রায়ের কাছে পাঠাতে চান সিনেমার গল্প লেখার জন্য। প্রথম বছরে ৩৫০, দ্বিতীয় বছরে ৪৫০ এবং তৃতীয় বছরে ৫৫০ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়। সে সময় তারাশঙ্কর মাসে চল্লিশ টাকা নিয়মিত উপার্জন করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি এই লোভনীয় প্রস্তাব ত্যাগ করেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে সাহিত্যিক তারাশঙ্করকে আমরা আর পেতাম না। 'আমার সাহিত্য-জীবন: ১ম পর্বে' এই ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই লোভ সংবরণ তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তরে করেছেন। যা তাঁর জীবনদর্শনের একটি দিক।

বাগবাজারে ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় মেয়ের শরীর খারাপের জন্য টাকা ধার করে ওষুধ কিনেছেন। অনেক সময় টাকার অভাবে ডাক্তারের ফিজ দিতে পারেননি। মেয়ের অসুস্থতায় বিচলিত তারাশঙ্কর বড়ো পত্রিকার অফিসে পাওনা টাকা নিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন, কিন্তু কখনো অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য লালায়িত হননি। স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছেন, স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়েছেন; কিন্তু চারিত্রিক সংযম সর্বদা বজায় রেখেছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে এরকমই এক চিঠি চালাচালিতে কটু কথার উত্তরে তারাশঙ্কর লেখেন একটি চমৎকার কথা 'সময় চলিয়া যায়, কথা দাঁড়াইয়া থাকে'।

## গ্রাম না-শহর

আমাদের বিবেচনায় তারাশঙ্করের লেখালেখির মূল ধাত্রীভূমি হল গ্রাম। লাভপুর গ্রামের অবদানের কথা আমরা আগেই বলেছি। লেখালেখির যে মূল বীজ তা তিনি গ্রামে থাকাকালীনই সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। গ্রামে থেকে গ্রামকে জেনেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। জমিদার বাড়ির সন্তান হলেও গ্রামের মধ্য থেকেই গ্রামকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমাজের ওপর তলার বা সমাজের বাইরের মানুষ হিসেবে গ্রামকে বা গ্রামের মানুষকে দেখেননি। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের কাজ করার সময় গ্রামের ভেতরের চেহারাকে, মান-অভিমানে জর্জরিত গ্রামের মানুষকে হাতের তালুর মতো দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামের যে রাস্তা সর্বজনীন স্বার্থে কেউ আদায় করতে পারেনি, সেখানে তারাশঙ্কর গিয়ে দাঁড়াতেই স্বেচ্ছায় জমির মালিক জমি দিয়েছেন। 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল তাঁর চোখে দেখা চরিত্র। বৈষ্ণবীদের আখড়ায় ঘুরেছেন, বাউল সাধকদের আখড়ায় রাত কাটিয়েছেন, সমাজসেবক হিসেবে গ্রামের কাজ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়ে পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে সভায় যোগ দিয়েছেন, ম্যালেরিয়ার মশা দূর করার জন্য পুকুরের পানা তোলার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন গুরুসদয় দত্তের আমলে, গ্রামে ভূতে পাওয়া লোক দেখেছেন, কংগ্রেসের হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন— ইত্যাদি বহুবিধ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামের আত্মাকে উপলব্ধি করেছিলেন। গল্প-উপন্যাসে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। তিনি তত্ত্ব মেনে সাহিত্য রচনা করতে বসেননি বা ইংরেজি বই পড়ে অথবা ইংরেজি সাহিত্য পড়ে সাহিত্য রচনায় হাত দেননি। এই কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে, গ্রামের মানুষকে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা শহরে এসেও তিনি গ্রামের সংগৃহীত উপাদান দিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন। কলকাতায় থাকাকালীন নিয়মিত লাভপুরে গিয়েছেন, এমনকী সেখানে গিয়ে তাঁকে নানারকম দান-ধ্যানও করতে হত। তারাশঙ্করের লেখা স্লিপ দেখিয়ে কেউ চাল, কেউ ওষুধ পেত। তিনি গ্রামে যাওয়া মানে গ্রামের মানুষের কাছে তাদের 'বড়োবাবু', তাদের আপনার জন তাদের কাছে এসেছে। তাদের নানারকম দাবিদাওয়া তাঁকে মেটাতে হোত। কাউকে ফেরাতেন না। তাঁর অনুরোধেই গ্রামের বিশু ডাক্তার বাইরে কোথাও না গিয়ে গ্রামেই থেকে গেছেন গ্রামের মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে। এখনও তিনি সেই কাজ করে চলেছেন।[২২] তারাশঙ্করের টালাপার্কের বাড়িতেও গ্রামের অনেকেই আশ্রয় পেয়েছেন। গ্রামের মানুষ ছিলেন বলেই তো কল্লোল গোষ্ঠীর আড্ডায় ঠিক সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারেননি। শহর নয়, গ্রামই আদ্যন্ত তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ: "তারাশঙ্কর গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন যোলো আনা পেশাদার সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা নিয়ে। আরও অনেক কিছুর মতো গ্রাম ও শহরের চরিত্র, সম্পর্ক নিয়ে তাঁর কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত ধারণা ছিল।... তারাশঙ্কর কৃতকর্মের সব থেকে বেশি সমর্থন

খুঁজেছেন, ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন ওই একটি মাত্রা থেকে। লক্ষণীয় সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নেও তিনি একই দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সমকালে গ্রাম থেকে আগত সাহিত্যিকের শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একাধিক উদাহরণ আছে, কিন্তু এই বিশেষ মাত্রা কারুরই চিন্তা ও কর্মে তারাশঙ্করের মতো দৃঢ় মুদ্রিত নয়।"[১৩] গ্রাম, গ্রামের জীবন, গ্রামে শেখা নীতিবোধ-আদর্শই তাঁর পাথেয় ছিল সারাজীবন।

সুতরাং ব্যক্তি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতে হলে জানতে হলে তাঁর 'আত্মকথা' সংকলনের রচনাগুলো পড়া আবশ্যক। ওপরের আলোচনায় ব্যক্তি তারাশঙ্করকে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তি তারাশঙ্কর এবং তাঁর রচিত সাহিত্যের আঁতুড়ঘর এই স্মৃতিকথাধর্মী রচনাগুলো। একজন লেখক কীভাবে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়ে উঠলেন তার মোটামুটি ধারাবাহিক বর্ণনাও 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থের দুই পর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্যক্তি তারাশঙ্কর, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর এবং তাঁর কালকে বোঝার জন্য তাঁর আত্মকথাধর্মী এই লেখাগুলো অবশ্যই আমাদের পড়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে সেকালের সামাজিক ইতিহাস এবং একজন লেখকের শূন্য থেকে শুরু করে সর্বজনমান্য একজন লেখক হবার যে লড়াই তা উপলব্ধি করা যায় গ্রন্থগুলো পাঠের মাধ্যমে। লেখকের জীবনদর্শনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রেও এই রচনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে প্রতিফলিত লেখকের জীবনদর্শনের সঙ্গে ব্যক্তি-লেখকের জীবনদর্শনকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ করে দেয় এই রচনাগুলো। তাঁর লিখনশৈলীর স্বকীয়তায় প্রতিটি আত্মকথাধর্মী রচনা হয়ে উঠেছে পাঠকদের বসিয়ে লেখকের আত্মকথা ও জীবনদর্শনের সজীব বর্ণনার বিবরণ শোনানোর নাটমঞ্চ।

সব মিলিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিনয়ী আত্মসচেতন গ্রামীণ মানুষ, যিনি দেশ এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হয়েও রাজনীতিসচেতন এবং সাম্যবাদে বিশ্বাসী থেকেও ভারতাত্মার একজন প্রগতিশীল লেখক হয়ে উঠেছিলেন।

## সূত্র

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আত্মকথা ১', কলকাতা: দে'জ, ২০২৩, পৃ. ২৫-২৭।

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৬ ব., পৃ. ২।

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আত্মকথা ২', কলকাতা: দে'জ, ২০২৩, পৃ. ৪৬৩।

৪. তদেব, পৃ. ২২৬।

৫. তদেব, পৃ. ১৪৮।

৬. তদেব, পৃ. ১৬০।

৭. তদেব, পৃ. ৪১৫।

৮. তদেব, পৃ. ৪১৮।

৯. তদেব, পৃ. ৪১৫-১৬।

১০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আত্মকথা ১', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২।

১১. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর', কলকাতা: ভারবি, ২০২১, পৃ. ১০০।

১২. দ্রষ্টব্য: মোনালিসা চন্দ্র, 'লাভপুরের বিশু ডাক্তার', কলকাতা: আনন্দ।

১৩. অরুণ নাগ, "স্বপক্ষতার বিশ্বাস", 'তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য', প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পা.), নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩, পৃ. ২৬৪।

# সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনিতে অপরাধ ও অপরাধী: একটি অধ্যয়ন

রাহুল দে

সারসংক্ষেপ

সত্যজিৎ গোয়েন্দাসাহিত্যের জগতে মূলত এসেছিলেন কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য। এ ছাড়া আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল, 'সন্দেশ'কে বাঁচিয়ে রাখা। কিশোরমনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও আকর্ষণীয় অর্থাৎ রহস্যকাহিনি, কল্পবিজ্ঞানমূলক কাহিনি— সেসবই নিজের লেখার অন্যতম উপজীব্য করে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ। সৃষ্টি করলেন ফেলুদা-কাহিনির। গোয়েন্দা ফেলুদার অনুসন্ধান-পদ্ধতি, অপরাধ-নির্ণয়ের কৌশল, অপরাধ-তদন্ত প্রক্রিয়ায় মগজাস্ত্রের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় বর্তমান আলোচনায় উঠে এসেছে। এরই সঙ্গে সত্যজিৎ ফেলুদা চরিত্রসৃষ্টিতে যেসব ত্রুটি রয়েছে, সেসব প্রসঙ্গও আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

ফেলুদা কাহিনির বিষয় মূলত চুরি, মানুষঠকানো, হত্যা, সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া ইত্যাদি। আলোচ্য নিবন্ধে সত্যজিতের সৃষ্ট বিভিন্ন অপরাধীচরিত্র ও তাদের সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সত্যজিৎ পূর্বসূরিদের পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে নির্মিত গোয়েন্দাকাহিনির আদর্শ থেকে নিজে কীভাবে সরে এসে ষোলো আনা বাঙালি এক গোয়েন্দাচরিত্রের সৃষ্টি করলেন, সেই প্রসঙ্গও আলোচিত হবে এ আলোচনায়। এ ছাড়া ব্যোমকেশের মতো ফেলুদাও কতটুকু শার্লক হোমসের দ্বারা প্রভাবিত, তার প্রসঙ্গও আলোচিত নিবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হবে।

বীজশব্দ: অপরাধবিজ্ঞান, কিশোরসাহিত্য, গোয়েন্দাসাহিত্য, ফেলুদা, শার্লক হোমস, শিশুমনস্তত্ত্ব ॥

---

**রাহুল দে:** সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনিতে অপরাধ ও অপরাধী: একটি অধ্যয়ন
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৬৭-৮১

সত্যজিৎ রায় তাঁর সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় শিশু-কিশোরদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছিলেন ফেলুদা চরিত্রের। কিশোর বয়সে নতুনকে জানার অভীপ্সায় মনে যে কৌতূহলের জন্ম হয়, সেই কৌতূহলকেই কিছুটা ত্বরান্বিত করতেই সত্যজিৎ সৃষ্টি করেছিলেন ফেলুদাকাহিনির। গোয়েন্দাগল্পে যে রহস্যের ভাবনা ঘনীভূত হয়, সেই রহস্য যে কিশোরমনের কৌতূহল বৈশিষ্ট্য দ্বারা আকৃষ্ট হবে, তা খুব সহজেই অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। তাই ১৯৬৫ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি ফেলুদার গোয়েন্দাকাহিনি সৃষ্টিতে নিয়োজিত থেকেছেন।

যে কোনো গোয়েন্দাকাহিনির দুটি পর্ব থাকে। প্রথম পর্বে লেখক রহস্য সৃষ্টি করার জন্য কাহিনিকে নির্মাণ করেন, দ্বিতীয় পর্বে তিনি গোয়েন্দাকে দিয়ে সেই কাহিনির জট ছাড়ান। এই গোয়েন্দা খুঁজে বের করেন অপরাধের শিকড়। কিন্তু গল্প লেখার আগেও একটি প্রস্তুতি দরকার। কাহিনি তৈরি করার জন্য কী ধরনের পটভূমি ব্যবহার করা হচ্ছে কাহিনির পৃষ্ঠভূমি হিসেবে, বা কাদের জন্য লেখা হচ্ছে সে গল্পটি; এর ওপর ভিত্তি করে সমস্ত কিছু বদলে যেতে পারে সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য। বক্তব্য-বয়ান সবকিছু পালটে যেতে পারে। ভিলেন চরিত্ররূপে শিশুসাহিত্যে আমরা যাকে ব্যবহার করব, প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে সেই হয়ে উঠবে হাস্যকর। উদাহরণস্বরূপ মগনলাল মেঘরাজ ফেলুদার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যথাযথ কিন্তু ব্যোমকেশের জন্য অনুকূলবাবুর দরকার। ফলে প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, প্রেক্ষিত নির্মাণের কাজ সমাধা হলে দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ভিলেনকে সৃষ্টি করা; যাকে আবর্ত করে ঘটনার বৃত্তটি গড়ে ওঠে ও একটি ক্রাইম সংঘটিত হয়। রহস্য জমে ওঠে, এরপর গোয়েন্দার প্রবেশ ঘটে ঘটনায় ও তার শানিত বুদ্ধির মাধ্যমে ভিলেন ধরা পড়ে, বিশ্বের সমস্ত গোয়েন্দা গল্পই মোটামুটি এই সূত্রটি অনুসরণ করে।

বাংলা সাহিত্যে অজস্র গোয়েন্দাচরিত্র রয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে দুজনকেই প্রকৃত অর্থে গোয়েন্দা বলা যায়। এরা হচ্ছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়। গল্পের প্রেক্ষাপটের উপস্থাপনায় উভয়েরই মুনসিয়ানা ছিল, তাই দুজনই মৃত্যুর এতদিন পরেও জনসমাজে সমান জনপ্রিয় হয়ে আছেন। কেবল অপ্রতিহত বেস্টসেলারই নয়, কয়েক প্রজন্মের নিরঙ্কুশ অনুরক্তিও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আসলে অন্যান্য সামাজিক গল্প লেখা ও গোয়েন্দাগল্প রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। এজন্য চাই নিপুণ মুনসিয়ানা। অনেক ক্ষেত্রেই রহস্যের জটিলতা যথেষ্ট ঘন হয়ে ওঠে না, প্লটে খামতি থেকে যায়, অপরাধীরা বিশ্বাসযোগ্য হয় না, গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেও পার্থক্য থাকে।

বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ফেলুদাকাহিনিতে অপরাধ ও অপরাধী। তাই প্রথমেই দেখে নেওয়া জরুরি যে ফেলুদার প্রতিদ্বন্দ্বী কারা। কারণ, বুদ্ধির লড়াইয়ে গোয়েন্দার বিপরীত মেরুতে যদি যথাযোগ্য ভিলেন না থাকে, তবে সেই গোয়েন্দার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। শুরুতেই ভিলেনদের বিষয়ে আলোচনা করে আমরা মূল বিষয়ে প্রবেশ করব। আলোচনার প্রারম্ভে ভাবতে হবে লেখককে বিষয় নিয়ে। ভিলেন হোক বা হিরো, খুন হোক বা চুরি, লেখা কোন পথে এগোবে, তা পুরোটাই দাঁড়িয়ে থাকে কনটেন্টের ওপরে। তাই এই বিশ্লেষণে ঢোকার আগে আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে ঠিক কী ধরনের পরিবেশ নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন লেখক সত্যজিৎ এবং ঠিক কী ধরনের সংগঠনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্রমশ সফল গোয়েন্দা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন রজনী সেন রোডের গোয়েন্দা ফেলুদা।

আমরা যদি এই তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব যে এই সামাজিক পরিবেশে

জমজমাট গোয়েন্দাকাহিনি রচনার উপাদান প্রায় নেই। এখানে অপরাধের বৈচিত্র্য নেই। বেশিরভাগ মানুষই আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল, সামান্য চাকরিজীবী কেরানি বা ব্যবসায়ী, খোলার চালের বাড়িতে বাস, কোনোভাবে দিনযাপন করে। এই প্রেক্ষাপটে মারাত্মক প্যাঁচালো ক্রাইমের চিন্তা করার অবকাশ প্রায় থাকে না। ফলে কিছু নির্দিষ্ট প্রোটোটাইপ ক্রাইম যেমন চুরি, ডাকাতি, পারিবারিক খুন, অর্থ লোভে হত্যা এই ধরনের অপরাধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অপরাধ। এগুলো মূলত পুলিশ কেস, গোয়েন্দাগল্প নির্মাণের জন্য যে পটভূমি থাকা দরকার, তা এখানে নেই। ক্রিমিনালমাইন্ড বলতে যা বোঝায় সেখানে অপরাধী হঠাৎ করে উত্তেজনার বসে কোনো ক্রাইম করে না, দীর্ঘ পরিকল্পনা করে ক্রাইম করে। এখানে তার অপরাধপ্রবণ মানসিকতার বিকাশ ও পরিণতি দেখা যায়। তাই পুলিশ কেস ও গোয়েন্দাগল্পের পটভূমির মধ্যে পার্থক্য আছে।

আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের 'ডিটেকটিভ' গল্পের আলোচনা করি, তবে দেখব যে রবীন্দ্রনাথের এই গোয়েন্দাবাবুটি কলকাতা শহরে সত্যান্বেষণ করে আদৌ মজা পায়নি। সে দেশি-বিলাতি যাবতীয় ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস পড়েছে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে নিতান্তই সাদামাটা কেসের বাইরে কিছু জোটাতে পারেনি। কাহিনির মধ্যে এক জায়গায় সে জানাচ্ছে:

> আমাদের দেশের অপরাধীগুলো ভীরু নির্বোধ, অপরাধগুলো নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা, দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনি নরক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কৌশল কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেকটিভ কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।[২]

রবীন্দ্রনাথের গল্পটিতে আমরা দেখি যে ডিটেকটিভের এই আক্ষেপ কার্যত বুঝিয়ে দেয়, কলকাতার নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতার মধ্যে রহস্য দানা বেঁধে ওঠার বিশেষ সুযোগ নেই। এখানে এমন কিছু ঘটে না, যা রহস্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ঘটনাই ঘটে থাকে। তাতেও হতোদ্যম না হয়ে ডিটেকটিভ প্রায়ই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন সন্দেহভাজন লোকজনের পিছু নিত, কিন্তু পরিণতিতে দেখা তারা নিরীহ সরকারি চাকুরে ছাড়া অন্য কিছু না।[৩]

আমরা প্রথম যুগের বাংলা গোয়েন্দাকাহিনিগুলোর মধ্যে দেখি যে লেখকরা প্রায়ই তাঁদের কাহিনির প্লটের সন্ধান করতে ইউরোপমুখী হয়েছেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়, পাঁচকড়ি দে, শশধর দত্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখক নির্বিচারে ইউরোপের সাহিত্য থেকে কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ডিটেকটিভ মানসচক্ষে লন্ডন, প্যারিসের হিংস্রকুটিল ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।[৪] তৎকালীন গোয়েন্দাকাহিনিগুলি উৎকৃষ্ট না হলেও বেশকিছু আকর্ষণীয় অপরাধ ও অপরাধীর সন্ধান যে দিয়েছে সে কথা বলার অবকাশ রাখে না। যথার্থ অর্থে ক্রাইমের সঙ্গে সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যোমকেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাঁর হাত ধরে বাংলা গোয়েন্দাসাহিত্য ইউরোপের প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশজ মাটিতে পদার্পণ করেছে।

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বাংলার জলবায়ু মাটিতে বড়ো হয়ে উঠেছে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যেভাবে শার্লক হোমসকে অকৃতদার রেখেছিলেন, শরদিন্দু তা করেননি। তিনি ব্যোমকেশকে পুরোপুরি গৃহী করেছেন।

বিবাহিত, অন্তর্মুখী, সংসারজীবন বিজড়িত, সন্তানের পিতা ব্যোমকেশকে বাঙালিয়ানা মডেল হিসাবে তৈরি করেছেন শরদিন্দু।[৫] এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শরদিন্দুর, দেশি ছাঁচে ইউরোপীয় বিষয়কে ঢেলে সাজানোর। ব্যোমকেশের ঘটনাগুলো অধিকাংশই শহর কলকাতায় ঘটে, সাধারণ মানুষই ঘটায়, কিন্তু এই রহস্যের তল পেতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয় গোয়েন্দাকে। প্রবাসী বাঙালি শরদিন্দু বুঝিয়ে দেন, চাইলে নিস্তরঙ্গ কলকাতা শহরেও টানটান রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করা সম্ভব।

শরদিন্দু যখন মোটামুটি কলম গুটিয়ে নিয়েছেন, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভাব হল সত্যজিতের। তাঁর গোয়েন্দা মধ্যবিত্ত ফেলুমিত্তির, খুড়তুতো ভাই তোপসে হল তার অ্যাসিস্টেন্ট। কিন্তু শরদিন্দুর পর গোয়েন্দাসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে সত্যজিতকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কারণ, তাঁর পাঠক ছিল মূলত 'সন্দেশ' পত্রিকার খুদে পড়ুয়ারা, শরদিন্দুর ছিল বৃহত্তর বঙ্গসমাজ। তাই সবকিছু নিয়ে লেখার স্বাধীনতা পাননি তিনি। কারণ প্রেম, পরকীয়া, বৈবাহিক অশান্তি, ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদি প্রাপ্তবয়স্ক বিষয়গুলি থেকে দূরেই থাকতে হয়েছিল তাঁকে। তাই সত্যজিতকে ভিন্ন পথ নিতে হয়েছিল। আলাদা সেট-আপ সাজাতে হয়েছিল, বলা বাহুল্য অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়েছিল।

এই সতর্কতার জন্যই হয়তো ফেলুদার কাহিনি নারীবিবর্জিত। কাহিনিতে শুধু ছেলেরাই থাকবে, মেয়েরা নয়। যদি মেয়ে থাকেও সে হবে শিশু বা বৃদ্ধ, দুয়েকটি ক্ষেত্রে গৃহিণীর কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের মুখ খোলার অবকাশ নেই। ১৯৬৫ সালে প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' এবং শেষ পূর্ণাঙ্গ লেখা 'রবার্টসনের রুবি' পর্যন্ত মেয়েদের বিষয়ে সত্যজিৎ বিন্দুমাত্র নমনীয়তা দেখাননি। ৩৫টি ফেলুদাকাহিনিতে সবমিলিয়ে পনেরোটি নারী চরিত্র পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শুধু ফেলুদা বলেই নয় 'প্রফেসর শঙ্কু' বা 'গল্প ১০১'— সবেতেই মেয়েদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আসলে সত্যজিৎ কিশোরদের লেখায় নারীদের সংসর্গে কোনোদিনই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। এইরকম নারী এবং পরিবারবর্জিত ভাবনার সুবিধা যেটা, লেখার সময় ঝামেলা অনেকটা কমে যায়। যৌনতা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পরিণয় ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার পড়ে না। চটুল হাসিঠাট্টা, বৈবাহিক রাগানুরাগ নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে হয় না। এ ছাড়া ফেলুদা নিজেও একটা বিপদজনক বয়সে অবিবাহিত হয়ে ঘোরাফেরা করেছিল। বংশ, স্বাস্থ্য, জীবিকা, ব্যবহার সব দিক থেকেই সুপাত্র বলা যেতে পারে ফেলুদাকে। কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শব্দ খরচ সত্যজিৎ কোনোদিনও করতে চাননি, কারণ তিনি তা খুব ভালোভাবে জানতেন যে অতিরিক্ত ঘটনার চাপে গোয়েন্দাকাহিনির গতি হ্রাস হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত ঘটনার সমাবেশ মানে অতিরিক্ত শব্দ খরচ। এ ছাড়া গোয়েন্দারা একা থাকাই পছন্দ করেন। নিখুঁত সামাজিকজীবন গোয়েন্দার জন্য নয়। তার গার্হস্থ্যভার যত কম হবে, ততই ভালো— গল্প দ্রুত অগ্রসর হতে পারে।

এতদূর পর্যন্ত ফেলুদাকাহিনিতে কী নেই, সে নিয়ে সামান্য আলোচনা হল। এবারে গল্পনির্মাণের দিকটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। গল্প-উপন্যাস গড়ে ওঠে প্লটের ওপর নির্ভর করে। রহস্যগল্পের ক্ষেত্রে এই প্লট নির্মাণের কাজটি আরও জটিল, কারণ জমজমাট পশ্চাৎপট না থাকলে কাহিনি জমে না। সত্যজিৎও ফেলুদার জন্য সেই সেট নির্বাচন করেছিলেন এবং সেই কাঠামোর মধ্যেই তিনি আগাগোড়া লেখালেখি করে গিয়েছেন। ফেলুদা অ্যান্ড কোম্পানির যাবতীয় গোয়েন্দাগিরি এই সেটের মধ্যে।

সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনিগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব যে সেখানে গল্পের যে প্লট, তা মূলত কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। যেমন:

১. কোন দুর্মূল্য বস্তুর চুরি হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি কাহিনি তিনি লিখেছেন।

২. কিছু কাহিনির কেন্দ্রে শহরের বনেদি পরিবারের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া নানান অপরাধমূলক ঘটনা।

৩. কিছু কিছু কাহিনির প্লট হচ্ছে পারিবারিক গুপ্তধনকেন্দ্রিক।

ফেলুদার ক্লায়েন্টদের অন্যতম বনেদি পরিবারের সদস্যরা। এ পরিবারগুলো ইংরেজ আমলে প্রচুর অর্থ অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পরও এরা শুধু বিত্তবাণই নয়, শিক্ষা এবং ভাষাজ্ঞানেও এদের প্রতিপত্তি অনেকখানি বজায় ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের তুলনায় এদের বিলাসপূর্ণ ঐশ্বর্যময় জীবন ছিল ঈর্ষা করার মতো। সত্যজিৎ এই পরিমণ্ডলেই হাজির করেছিলেন ফেলুদাকে। সত্যজিৎ নিজেও অনেকটা এমনই এক পরিবারে জন্মেছিলেন। ফলে লেখার ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে এসেছিল। পুরোনো জমিদারি বাড়ি মানেই তার মধ্যে লুকোনো থাকে অজস্র ইতিহাস, গায়ে কাঁটা দেওয়া পারিবারিক গালগল্প। সত্যজিৎ অনুভব করতে পেরেছিলেন এই পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে তিনি যদি তাঁর গল্প সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলেই কিশোর পাঠকের মনে তিনি নিজের স্থান করে নিতে পারবেন। এ ছাড়া এই পুরোনো সময় এবং পরিবারগুলির প্রতি সত্যজিতের এক রকম পক্ষপাতিত্বও ছিল, সেই মানসিকতার প্রচুর নমুনা ছড়িয়ে আছে ফেলুদার কাহিনিতে। স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতা যেদিকে এগোচ্ছিল, তা সত্যজিৎ যেন কোনোদিনই মানতে পারেননি, তাই আরও বেশি করে পুরোনো কলকাতার মানুষ এবং জীবনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিলেন তিনি।

এখানে একটা লক্ষ করার মতো ব্যাপার যে পরিবারগুলোর চিত্র এখানে উঠে এসেছে, সেই পরিবারগুলো সময়ের জাঁতাকলে ক্ষয়িষ্ণু। ফেলুদাকাহিনির এই পরিবারগুলো বেশিরভাগই ভাঙা, অনেকটা বর্তমানকালের আণবিক পরিবারগুলির মতো, এখানে কেউ-বা পত্নীহীনা, কেউ-বা অবিবাহিত, কারও আবার ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বিপুল সম্পত্তি ও বৈভবের মধ্যে এই মানুষগুলো কার্যত একা বাস করতেন। বনেদি কলকাতার শেষ প্রজন্ম ছিলেন এরা। সত্যজিতের অনেকগুলো গল্পের প্লটের কাঠামোই এই প্যাটার্নের ওপর নির্ভর করে তৈরি।[৬]

ফেলুদাকাহিনিতে আমরা বিভিন্ন ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। কলকাতার পাশাপাশি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ফেলুদাকে যেতে হয়েছে, এমনকী বিদেশেও চরিত্রদের নিয়ে গেছেন বিভিন্ন গল্পে তিনি। কেদারনাথ, চেন্নাই, কাঠমান্ডু, কাশ্মীর, রাজস্থান, কাশি, দার্জিলিং, মুম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, হংকং, লন্ডন— বিস্তৃত জায়গায় ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি করেছেন বলে পাঠকও সুযোগ পেয়েছে নিত্য নতুন স্থানে ভ্রমণ করার। একই সঙ্গে ভ্রমণকাহিনি ও রহস্য গল্পের মজা নিতে পেরেছেন পাঠক। গল্পের ইন্টেন্সড মুহূর্তগুলো কেটে গেছে ভ্রমণের পথ চলতি আনন্দে।

ফেলুদাকাহিনিতে কখনো পুরোনো জমিদার বাড়ির অলিন্দে জমে উঠেছে রহস্য, আবার কখনো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে দূরদেশে, এবং একইভাবে নট-নটিরাও পরিস্থিতি বিশেষে যথাসাধ্য অভিনয় করে গেছেন। তবে সত্যজিৎ এই পরিকল্পনায় পুরোপুরি খুশি হতে পারেননি। কাহিনিগুলো তাঁকে সাজাতে হয়েছিল পাঠকের মুখ চেয়ে, কিশোরমনের সীমাবদ্ধতা বুঝেই সেই মতো কাহিনিকে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য তৈরি করা যাচ্ছিল না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। জানিয়েছিলেন কিশোর-কিশোরীদের কথা না ভাবলে 'ফেলুদা' লেখা অনেক সহজ হত। যে কোনো ক্রাইম নিয়ে লেখা যেত। ছোটোদের কথা মাথায় রেখেই তিনি খুন, জখম, চুরি ইত্যাদি অল্প কিছু

ছককাটা নিয়মের মধ্যেই সত্যজিৎ ফেলুদার কাহিনিগুলিকে আবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছেন। রহস্য গল্প লেখার ক্ষেত্রে এমন বাঁধা লেখকের জন্য রীতিমতো সমস্যার বিষয়।[৭]

এই সমস্ত সীমার মধ্যে থেকেও সত্যজিৎ কিন্তু কাহিনিতে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। 'নেপোলিইয়ানের চিঠি', 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা', 'শিয়াল-দেবতার রহস্য', 'সমাদ্দারের চাবি', 'ফুলঘুটিয়ার ঘটনা', 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' ইত্যাদিতে প্রচুর রহস্যের জটিলতা ছিল। কোথাও রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিনের ব্যবহার করেছেন, কোথাও বেঁটে বামনকে দিয়ে ক্রাইম করানো হয়েছে, কোথাও-বা ফেলুদা নিজেই চোরকে ধরেছে। সবমিলিয়ে কিশোর-সাহিত্য হলেও রহস্যের অভিনবত্বের সঙ্গে একটুও ভাটা পড়েনি সাসপেন্স তৈরিতে। সাসপেন্স তৈরিতে বড়ো গল্পের তুলনায় ছোটোগল্পগুলো রহস্যের একমুখীনতার জন্য বেশি জমাট বেঁধেছে। কিন্তু বড়ো গল্প বা ভ্রমণমূলক লেখাগুলো পড়ার সময় যে সাসপেন্স তৈরি হয়েছিল, রহস্যের সমাধানের সময় তা ততটা জটিল নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'এবার কাণ্ড কেদারনাথ', 'দার্জিলিং জমজমাট', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'র কথা।

যে কোনো ক্রাইমকাহিনিতে অপরাধ কতটা গুরুতর হবে, তা নির্ভর করে কাহিনির ভিলেনের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার ওপর। প্রকৃতপক্ষে অপরাধী যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ মেধাবী না হলে কাহিনি ঠিক জমে না। কারণ গোয়েন্দাগল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়টি হচ্ছে দুই প্রতিপক্ষ বুদ্ধির লড়াই। তাই গোয়েন্দা নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে লেখককে অনেক বেশি ভাবতে হয় খল চরিত্রকে নিয়ে। সত্যজিতকেও ভাবতে হয়েছিল সে কথা। ফলে পুরো গোয়েন্দা সিরিজেই নানা শ্রেণির খলচরিত্রকে তুলে এনেছেন তিনি। তাদের কেউ মগনলাল মেঘরাজের মতো মোটা দাগের, কেউ বিলাস মজুমদারের মতো ধূর্ত, কেউ-বা বাটরার মতো খুনি। কেউ-বা ছদ্মবেশী, কেউ আবার পিতৃঘাতী, নিখুঁত তস্করও বেশ কয়েকজন। অবশ্য সবাই বুদ্ধি প্রয়োগ করে অপরাধ করেছেন এমন নয়, অনেক সময় মুহূর্তের উত্তেজনাতেও ঘটনা ঘটে গেছে। তাই নানা কিসিমের ভিলেনকে দেখা যায়।

অপরাধীদের মধ্যে প্রথমেই নাম আসে মগনলাল মেঘরাজের। এরা ঠিক সচরাচর গোয়েন্দা গল্পের ভিলেন নয়, বরং রুপোলি পর্দায় এদের মানায় ভালো। মোটা চেহারা, মার্কা মারা অপরাধী, বিপুল সব ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত, দেশজোড়া এদের অপরাধের জাল। এবং কোনো নির্দিষ্ট ক্রাইম নয়, টাকার জন্য এরা করতে পারে না এমন কিছু নেই। সমাজের ক্ষমতাবান, উচ্চস্তরের মানুষদের সঙ্গে এদের ওঠাবসা, পুলিশ-প্রশাসন সবকিছুই হাতের মুঠোয়। ফলে একধরনের বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে এরা ঘোরাফেরা করে। সর্বসমক্ষে অপরাধ করে বেড়ায় এরা। খোলাখুলি হুমকি দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানিয়ে দেয় যে অপরাধটা করতে যাচ্ছে, কারও ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাক। ফেলুদার সঙ্গে অন্তত তিনবার মোলাকাত হয়েছে মগনলালের, প্রতিবারই উচিত শিক্ষা পেয়েছে সে, তবু তাকে দমানো যায়নি। এমনকী 'গোলাপি মুক্তারহস্য' গল্পে কাশী থেকে কলকাতায় এসে ফেলুদার বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেছে মগনলাল। জেনেশুনেও তাকে আটকানো যায়নি।

কাঁচা টাকার উল্লাসে ও তার ক্ষমতার দম্ভে যাবতীয় শাসনবিধি তছনছ করে এগিয়ে গেছে এই ব্যবসায়ী পুত্রটি। স্বাধীনতার আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একধরনের কালোবাজারিদের জাল সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল; উপমহাদেশের যাবতীয় ধনসম্পত্তি এরা নিজেদের কব্জায় নিয়েছিল। মগনলাল তারই উত্তরসূরী। সত্যজিৎ এই মগনলাল চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তাদেরকেই তুলে ধরেছেন। সাময়িকভাবে পরাজিত করা গেলেও কোনো কিছু করেই চিরদিনের জন্য আটকানো যায় না এদের। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর আবার স্বমূর্তি ধারণ

করে। সত্যজিৎ এদের চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই প্রত্যেকবারই নিজের মতো করে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ কিছু করার আগেই, সত্যজিৎ ফেলুদাকে দিয়ে এদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্য দিয়ে পোয়েটিক জাস্টিস থাকলেও থাকতে পারে। আরও কিছু ভিলেন চরিত্র যেমন 'টিনটোরেটোর যিশু'তে সোমানি, 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'তে গোরে, 'গোলাপি মুক্তা রহস্য'তে সূরয সিং, 'গোরস্থানে সাবধান'-এ মহাদেব চৌধুরী— সকলেই মগনলালের সমগোত্রীয়। মহাদেব সম্পর্কে তোপসেকে ফেলুদা বলেছিল:

> এসব লোককে দাবিয়ে রাখা যায় না। পুলিশও কিছু করতে পারে না। মহাদেব চৌধুরীর মতো লোকগুলো এক একটা হিটলার। কাজ গুছিয়ে নিতে এরা কত লোককে যে টাকার জোরে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে তার ঠিক নাই।[৮]

কিন্তু মগনলালদের মতো বড়ো অপরাধীদের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ তেমনটা হয় না, সে বড়ো অপরাধী কিন্তু মগজাস্ত্রের চেয়ে সে বেশি নির্ভরশীল নিজ সামাজিক ক্ষমতার ওপর। তাই যেখানেই ভিলেনের সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় মিলে ক্রাইমকাহিনির ক্ষেত্রে সেই ধরনের প্লটই হচ্ছে উচ্চস্তরের গোয়েন্দা কাহিনি রচনার উপাদান। এমন অপরাধী থাকে আপাতদৃষ্টিতে অপরাধী বলে চেনার উপায় নেই। এমন অপরাধী বেশি দুঃসাহসিক, এবং কী সময় সময়ে  কাহিনির গোয়েন্দার সঙ্গে যেচে টক্কর নেওয়ার ক্ষমতা ধরে। ফেলুদা সিরিজেও এমন কিছু অপরাধী রয়েছে। এরা প্রায় হাত বাড়িয়ে ফেলুদার সঙ্গে মিশেছে, পাশের ঘরে রাত কাটিয়েছে এমনকী  কিছু মক্কেল হয়েও দেখা দিয়েছে। গল্পে তাদের অভিসন্ধি কোনোভাবেই বোঝা যায়নি। এরা ফেলুদার কাছাকাছি থেকে তার পদক্ষেপ এবং মানসিকতা আগে থেকে বুঝে নিয়ে সেই মতো নিজেদের পরিকল্পনাগুলো এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুযোগ পেলে ফেলুদাকে ভুল পথ দেখিয়েছে, যাতে সে পথভ্রষ্ট হয়। মেধায় এরা ফেলুদারই সমতুল্য, কিন্তু পরিস্থিতিতে ফেলুদার বিপরীত। 'হত্যাপুরী'তে বিলাস মজুমদার যেমন সম্পূর্ণ একজন ভিন্ন লোকের পরিচয় নিয়ে ফেলুদার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল, তারপর সে অবাস্তব কাহিনি বানিয়ে নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ফেলুদার কাছে হার মানতে হয়। তবে তার বুদ্ধি প্রশংসনীয়। 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'তে রয়েছে বাটরা চরিত্রটি, সে উপন্যাসে আগাগোড়া দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে— একজন আসল বাটরা, যে ফেলুদার মক্কেল। অপরজন নকল বাটরা, যে ভয়ংকর সব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। বাটরার পূর্বসুরী হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এর শশধর বসুকে। সে নিজের দোষ ঢাকতে ড. বৈদ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। যাতে কোনোরূপ সন্দেহ হলেও সেটা যেন ড. বৈদ্যের ওপর গিয়ে পড়ে, সে থেকে যায় নিরাপদে। তবে এরা কেউই বিশ্বনাথ মজুমদারের সমতুল্য নয়— 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'তে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একই সঙ্গে পিতা, পুত্র ও ম্যানেজারের মেকআপ নিয়ে সে ফেলুদাকে বোকা বানিয়েছিল। আবার এমন কিছু কাহিনি রয়েছে যেখানে অপরাধী নিজে মক্কেল সেজে হাজির হয়েছে। যেমন 'শেয়াল দেবতা রহস্য', 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা', 'নয়ন রহস্য' গল্পে অপরাধী নিজে মক্কেল সেজে এসেছিল, যাতে সে গোয়েন্দার হাতে ধরা না পড়ে।

ব্যোমকেশের 'দুষ্টচক্র' গল্পেও এরকম এক অপরাধী রয়েছে, যে সকলের সামনে নাটক করত প্যারালাইসিসের রোগী হিসেবে, বিছানায় শুয়ে থাকত কিন্তু আড়ালে নিখুঁত খুনের পরিকল্পনা করে সফলও হয়েছিল। ব্যোমকেশকে সে তার বাড়িতে ডেকে নিজের অসুস্থতার চিহ্ন দেখিয়ে বিশ্বাস অর্জন করেছিল। অপরাধীকে খোঁজার জন্য এই

গল্পে ব্যোমকেশকে রীতিমতো মগজাস্ত্র চালনা করতে হয়েছে। উৎকৃষ্ট গোয়েন্দাকাহিনি সচরাচর এমন ভিলেনকেই প্রত্যাশা করে।

তৃতীয় ধরনের অপরাধে অপরাধীরা কিন্তু ওপরের দুই শ্রেণির মতো নয়। এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের এবং ফেলুদার কাহিনি ছাড়া এদের সেভাবে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের বিশেষ একসময়ের আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের ইতিহাস এই অপরাধীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের কথায় আসার আগে পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে ফেরা জরুরি। সত্যজিতের লেখায় কলকাতার অভিজাত সমাজের একটা ছায়া আছে। কিন্তু সেই অভিজাত সমাজের অবশেষ মাত্র রয়েছে। সামান্য কিছু জৌলুসের চিহ্ন ছাড়া যার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। কোনোক্রমে পড়ে রয়েছে কিছু বৃদ্ধ মানুষ, পুরোনো কিছু সব শখ-সৌখিনতা আগলে।

এইসব পুরোনো বাড়িতেই ঘটে যায় বিভিন্ন রকমের ক্রাইম। বৃদ্ধদের জিনিসপত্র চুরি যায়, এরা প্রবঞ্চিত হন, অনেকক্ষেত্রে খুন হয়ে যায়। মানুষ খুন হয়ে যাওয়া ফেলুদার একটা রিকারেন্ট মোটিফ। 'নেপোলিয়নের চিঠি', 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা', 'ড. মুন্সির ডায়েরি', 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'দার্জিলিং জমজমাট' ইত্যাদি প্রায় সাত-আটটি লেখায় এটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এর বাইরে চুরি রাহাজানি তো রয়েছে, যেমন 'টিনটোরেটর যীশু', বা 'বোসপুকুরে খুনখারাপি' ইত্যাদি। এবার জানা দরকার এই ক্রাইমগুলো করছে কারা? যদি লক্ষ করা যায়, তবে স্পষ্ট হবে যে এই অপরাধগুলোর সঙ্গে জড়িত সাধারণত দু-ধরনের মানুষ। এক বাইরের লোক, যেমন প্রাইভেট সেক্রেটারি বা কাজের ক্ষেত্রে সহকারী। এমন নয় যে এই লোকগুলো লোভে তাড়নায় পাপ করেছে। অধিকাংশই নিজেদের পুরোনো বক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে কাজ নিয়েছে এইসব বাড়িতে। এবং তাদের শিকার এই বৃদ্ধ লোকজন। আজকের এইসব বৃদ্ধরা যৌবনে বিভিন্ন কুকীর্তি করে রেখেছিলেন, দুয়েকটি অসাবধানতাবশত খুনও করেছিলেন এবং আইনের ফাঁক গলে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই পাপের খেসারত শেষজীবনে চুকিয়ে যেতে হয়েছে। ভিকটিমের পরিবারেরই কেউ, মূলত সন্তানরাই ফিরে এসে প্রতিশোধ নিয়েছে। একটি মাত্র ক্ষেত্রে শুধু বৃদ্ধ মানুষই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন 'গোলকধাম রহস্য'-এর অন্ধ বৈজ্ঞানিক নীহার দত্ত। কিন্তু সেখানেও একটা প্রতিশোধের কাহিনি লুকিয়েছিল। এরা কেউ পেশাদার খুনি নয়, কিন্তু দিনের পর দিন নিজের অন্তরে লালিত প্রতিশোধস্পৃহাই এদের দিয়ে হত্যা করিয়েছে।

কিন্তু এর থেকেও মারাত্মক হল দ্বিতীয় শ্রেণির, যারা কিনা ঘরেরই লোক এবং আরও সঠিকভাবে পরবর্তী বংশধর অর্থাৎ পুত্র। পুত্রের হাতে পিতা খুন ('দার্জিলিং জমজমাট', 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা', 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর) বা চুরির ঘটনা ফেলুদায় প্রায়ই ঘটেছে। এই খুনি বা চোরেরা প্রায় সকলেই ফেলুদার প্রজন্ম, বা বয়সে সামান্য বড়ো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অর্থের প্রয়োজনে। এই অর্থের দরকার পড়েছে বিভিন্ন কারণে— কেউ রেস খেলেছে, কেউ জুয়া, কেউ সিনেমায় নামতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, কেউ-বা ব্যাবসা করতে গিয়ে ডুবেছে। অভিজাত সমাজের বদরক্ত এদের মধ্যে বাহিত হয়েছে, প্রচুর অর্থ এরা নিয়মিত নষ্ট করেছে, সে তুলনায় কিছুই প্রায় রোজগার করতে পারেনি। অন্যদিকে নতুন কিছু চেষ্টা করলেও এদের ক্ষমতায় কুলোয়নি, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে এরা ক্রমশ বাতিলের খাতায় চলে গেছে। খেয়াল করলে দেখা যায়, প্রায় সবক্ষেত্রেই এদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছেন বাবারা। ছেলের লাম্পট্য মানতে চাননি, কিন্তু বশেও আনতে পারেননি, ফলে পরিশেষে কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে। এরাও যে দাগি অপরাধী তা নয়, তবে অপরাধের ধরন অনেক সময়ই বেশ পরিকল্পিত ও নৃশংস।

সব গোয়েন্দারই কিছু বিশেষ ক্ষমতা আবার কিছু দুর্বলতা থাকে, ফেলুদাও তার ব্যতিক্রম নন। সত্যজিৎ ফেলুদাকে সব দিক দিয়েই সুপুরুষ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, নীতিবান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন একটি আদর্শবান চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এই আদর্শবান চরিত্রেরও যে কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে, সেই দিকগুলো একটু অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

ব্যোমকেশের একটি গল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। 'মাকড়সার রস' অত্যন্ত পরিচিত কাহিনি, জনপ্রিয়ও, তবু এটি বেছে নেওয়া হল, কারণ গতানুগতিক গল্পের ধারায় 'মাকড়সার রস' ঠিক পরে না, এর মধ্যে বেশ একটা মজা লুকিয়ে আছে। সাধারণত ডিটেকটিভ উপাখ্যানের ক্ষেত্রে যেমন হয়, প্রথম একটা রহস্য ঘনিয়ে ওঠে, তারপর গোয়েন্দার তলব হয়, স্পটে গিয়ে গোয়েন্দা তত্ত্বতালাশ চালান, পরিশেষে গিয়ে সমাধান মেলে— ঠিক এমন সরলরৈখিক বিন্যাসে গল্পটি এগোয়নি। বস্তুত, লেখক অপরাধ স্থল থেকে ব্যোমকেশকে দূরে রেখেছিলেন। শরদিন্দু তখন ব্যোমকেশকে অন্য কেসে ব্যস্ত রেখেছিলেন, যেন এই ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতে পারবে না। তাই বাধ্য হয়ে অজিতকে একাই যেতে হয়েছিল। অজিত বহুদিন ধরে ব্যোমকেশের সাগরেদি করছে, ফলে তদন্তের নিয়মগুলো তার জানা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অজিত ব্যর্থ হয়, সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখেও বুঝতে পারে না কোথায় দানা বেঁধে আছে রহস্যের শিকড়। অজিত বাড়ি ফেরে, ব্যোমকেশকে জানায় সে কী দেখে এসেছে, আর সেইসঙ্গে নিজের মতো করে একটা সম্ভাব্য সমাধানের কথাও বলে, যা অবিশ্বাস্য হাইপোথিসিস ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে ব্যোমকেশ পুরোটা শোনার পর প্রায় এক মুহূর্তেই লক্ষ্যভেদ করে ফেলে। দেখা যায় ব্যোমকেশের অনুমানই ঠিক ছিল। এই গল্পের মজা এটাই যে, রহস্য সমাধানের জন্য অজিতকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলে না যাওয়ায় ব্যোমকেশকে নির্ভর করতে হয়েছে পুরোপুরি অজিতের বিশ্লেষণের ওপর এবং ব্যোমকেশ ঘটনার বিষয় যাই জেনেছে, তা অজিতের দেখে আসা দৃশ্য থেকে। কিন্তু এই সীমিত তথ্যকে অবলম্বন করেই ব্যোমকেশ তার নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে, যা অজিতের সাধ্যে কুলোয়নি। যদিও অজিত তদন্তে যাওয়ার পূর্বে আস্ফালন করে বলেছিল যে সে খুব সহজেই এই কেসের সমাধান করবে।[৯] কিন্তু শেষে তাকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।

'মাকড়সার রস' নিয়ে এত কথা বলা হল এই কারণে যে, ফেলুদার কাহিনিও এই গল্পের মতো নয় বরং সম্পূর্ণ উলটো। একমাত্র 'অপ্সরা থিয়েটার মামলা' গল্পটি 'মাকড়সার রস'-এর অনুসরণে লেখা। যেখানে পায়ে আঘাত লাগার জন্য ফেলুদাকে ঘরে থাকতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। তদন্ত করেছিল লালমোহনবাবু ও তোপসে। দুজনের জেরা করার ওপর নির্ভর করেই ফেলুদা রহস্যের সমাধান করেছিলেন। কিন্তু বাকি কোনো গল্প ও উপন্যাসে সত্যজিৎ এই প্যাটার্ন অনুসরণ করেননি, বরং তুলনামূলক নিরাপদ দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

সাধারণত গোয়েন্দাগল্পের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে লেখক সহকারী এবং পাঠককে বিশেষ সুযোগ দিতে রাজি থাকেন না। রহস্যটা সকলের সামনে দেখা দিলেও, রহস্যের সমাধান করে উঠতে পারে না সবাই। লেখক বড়োজোর গল্পের ভাজে ভাজে কিছু সূত্র ছড়িয়ে যান, কিছু তথ্যের উল্লেখ করেন, ওই পর্যন্তই। আস্তিনের আড়ালে নিশ্চিতভাবেই লুকোনো থাকে মূলরহস্য, যা সমাধান করবার ক্ষমতা শুধু গোয়েন্দারই থাকে। কাহিনির শেষে গিয়ে বোঝা যায়, রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে গোয়েন্দার সহকারী এবং পাঠকের তেমন করণীয় কিছুই ছিল

না। জট ছাড়ানোর মূল সূত্রগুলি প্রায় ক্লাইম্যাক্সে এনে হাজির করানো হয়। বস্তুত, গোয়েন্দাকাহিনির গোয়েন্দা যে আর দশটি সাধারণ মানুষের মতো নয়, অন্তত তার সহকারীর তুলনায় সে যে শাণিত বুদ্ধির অধিকারী এটা বোঝাতে গল্পের বাইরেও কিছু কিছু সম্ভাবনা তুলে রাখা হয়, এবং কাহিনির শেষে পৌঁছে দেখা যায় সেই সম্ভাবনাগুলোই সমাধান, অথচ তা কেবল গোয়েন্দাই জানতে পেরেছে, বাকিরা থেকে গেছে অন্ধকারে। ফেলুদার সিংহভাগ গল্প-উপন্যাসে এই ফর্মুলা অনুসরণ করেছেন সত্যজিৎ। আমরা ফেলুকাহিনিগুলো আলোচনা করে এর সত্যতা যাচাই করব।

যদি প্রশ্ন করা হয় 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা'তে রহস্যের গিটটি কোথায়? পাঠক উত্তর দেবেন রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিনের ব্যবহারে। 'সোনার কেল্লা' নিয়ে এই প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে ডক্টর হাজরাকে চিনে নেওয়ায়। সিগনেচারের গোলমাল ও ভুয়ো দড়ির ফাঁসে নিজেকে বেঁধে রাখা তার অপরাধী হওয়ার প্রমাণ তুলে দেয়। 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এর রহস্যে শশধর বোস আর ডাক্তার বৈদ্য যে একই লোক সেটা বুঝতে পারা। বোঝা গেল আঙুলে মা লেখা আংটিটা নেই বলে। 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' বাটরা যে দুজন একই ব্যক্তি সেই কথা ধরতে পারা যায় দুটি তথ্য থেকে। যে দুটো তথ্য থেকে— এক, বাঁ-হাতি কলমের নিপটা ক্ষয়ে যাওয়া, দুই অফিসে বাটরার নামের আদ্যাক্ষর। 'হত্যাপুরী'তে আমরা দেখি নকল বিলাস মজুমদার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারা। 'টিনটোরেটর যিশু'তে আমরা দেখি খিঁচ ওঠা হচ্ছে নকল রুদ্রপ্রসাদ এবং রবিনবাবুর পরিচয়। জানা যাচ্ছে একজনের জুতো দেখে, অপরজনের খাওয়া দেখে, সেই সঙ্গে সুদূর হংকং-এ পুরোনো ম্যাগাজিন একটি হাতে পেয়ে। ''সমাদ্দারের চাবি''তে আমরা দেখি রহস্যের জট ছাড়ছে দুটি সূত্র থেকে। প্রথম লোডশেডিং-এ প্রেস বন্ধ থাকা। দ্বিতীয় ''ধরণী... আমার নামে... চাবি... চাবি''। 'বোসপুকুরের খুনখারাপি'তে আমরা দেখি: এক. আম আঁটির ভ্যাপু, দুই. হুকুমচাঁদ, তিন. প্রদ্যুৎবাবুর খোরা হয়ে চলাফেরা করা। 'রবারটসনের রুবি'তে আমরা দেখি প্রথমে দারোগাকে ক্রিশ্চিয়ান বুঝতে পারা এবং পরবর্তীতে পাদ্রি প্রিচাডের বই। 'শিয়ালদেবতার রহস্য'তে আমরা দেখি বেঁটে লোকটিই আসল কালপ্রিট, ফটোগ্রাফের ছবি দেখে সেটা বুঝতে পারা। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ আমরা দেখি কারাণ্ডিকারের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন, জানা যাচ্ছে সুরেশ বিশ্বাসের বই থেকে। ''ভূস্বর্গ ভয়ংকর''-এ আমরা দেখি প্রয়াগ এবং মিস্টার সরকারের গোপন করা ইতিহাস, উল্কি, প্লেনের যাত্রীতালিকা ইত্যাদি দেখে বোঝা যায়।

এখানে যে দশ-বারোটি উপন্যাসের উদাহরণ দেওয়া হল, এর একটিও তোপসে বা জটায়ুর পক্ষে একা সমাধান করা সম্ভব ছিল না, কারণ কোনো ক্ষেত্রেই সমাধানের সামান্যতম সূত্রও আগে জানানো হয়নি। অবশ্য ফেলুদা জেনেছে; কিন্তু তোপসে বা লালমোহনবাবুর আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে, অর্থাৎ পাঠকও থেকেছে অন্ধকারে। কিছু ক্ষেত্রে ফেলুদা স্বতন্ত্র তদন্ত চালিয়েছে, তোপসেকে বাড়িতে রেখে বেরিয়ে গেছে তথ্যের খোঁজে, কিন্তু কী জানল তা ফিরে এসে জানায়নি। গল্পের একেবারে ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে তার উল্লেখ করা হয়েছে। 'হত্যাপুরী'তে মূল রহস্য বিলাস মজুমদারের পরিচয়, এবং তিনি যে নকল তা জানা যায় কাঠমাণ্ডুতে তত্ত্বতালাশ করে, অথচ সেটা ফেলুদা ছাড়া বাকিরা জানতে পারে না। 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' বা 'ডক্টর মুন্সির ডায়েরী'তেও এরকম গোপন তদন্তের ব্যাপার রয়েছে। প্রায়ই তোপসে বা লালমোহনবাবু, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা যে সমস্ত তথ্য পাননি, এও সত্য। 'হুকুমচাঁদ' যে একটা ঘোড়ার নাম এটা জানলে এবং সেই সঙ্গে রেসের মাঠে প্রদ্যুৎবাবুকে দেখতে পেল 'বোসপুকুরে খুনখারাপি'র রহস্যভেদ কঠিন নয়, কিন্তু

প্রদ্যুৎবাবুকে শুধু ফেলুদাই দেখেছে, লালমোহনবাবু বা তোপসে দেখেনি, বলা ভালো তাদের দেখানো হয়নি। ‘ডাক্তার মুন্সির ডায়েরি’তে পুরো রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে অনুসন্ধানের ফলে, কিন্তু সেই তদন্ত শুরু ফেলুদাই করেছে। ‘টিনটোরেটোর যীশু’তে আসল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে হংকং-এ পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িতে প্রাপ্ত ম্যাগাজিন থেকে। সেখানে নন্দবাবুর ছবি না দেখলে জাল রুদ্রশেখরের পরিচয় জানা যেত না। সে ম্যাগাজিন শুধু ফেলুদার চোখেই পড়েছে, ফেলুদা তা পকেটস্থ করেছে, এবং যতক্ষণ না সমাধানের সময় আসে, ততক্ষণ পকেট থেকে বের করেননি।

‘শকুন্তলার কণ্ঠহার’ এবং ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’— এই দুটি উপন্যাসে এক জায়গায় মিল ছিল, দুটি ক্ষেত্রে দুই মহিলাই ফেলুদাকে রহস্যের সমাধান বাতলে দিয়েছিলেন। প্রথমজন সংগোপনে এসে ফেলুদার সঙ্গে দেখা করেছিল, সব কিছু খোলাখুলি জানিয়ে গিয়েছিল। অথচ তখন হোটেলে ফেলুদা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর দ্বিতীয়জন সরবরাহ করেছিলেন জরুরি রেকর্ডিং, কিন্তু তা শুধু ফেলুদাই শুনেছে। ‘কৈলাসে কেলেঙ্কারি’তে লুকোনো গুহা থেকে পাওয়া গিয়েছিল রক্ষিতের রেনকোট, রক্তমাখা শাবলও আবিষ্কৃত হয়েছিল মনসার ঝোপ থেকে, কিন্তু তাই জাটায়ু জানতে পারেনি। নাটকীয়ভাবে কাহিনির শেষে ফেলুদা সেসব হাজির করেছে। এরকম আরও বেশ কিছু খুঁটিনাটি কথা বলা যেতে পারে। ‘বাক্স রহস্য’-এ মিস্টার পাকরাশির নকল দাঁত ও পুরোনো বইয়ের গন্ধ, ‘এবার কাণ্ড কেদেরনাথ’-এ জুনিয়র পুরির চুলের টেরি, ‘অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য’-এ নতুন কেনা চশমা, ‘সোনার কেল্লা’য় আসল ডাক্তার হাজরাকে খুঁজে বের করা, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ সুরোজলাল মেঘরাজের পরিচয় ইত্যাদি।

এর বাইরেও ফেলুদার নিজের ছদ্মবেশ নেওয়া (‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, ‘কৈলাসে কেলেঙ্কারি’, ‘অন্তর্ধান রহস্য’) এবং কিছু ক্ষেত্রে তস্করবৃত্তি গ্রহণও (‘ইন্দ্রজাল রহস্য’, ‘জাহাঙ্গীরের স্বর্ণ মুদ্রা’, ‘গোসাইপুর সরগরম’) উল্লেখযোগ্য। এতে গল্পের বৈচিত্র্য বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ফেলুদা আশ্চর্য নীরবতা পালন করেছে। জটায়ু বা তোপসে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে ফেলুদা ছদ্মবেশ নিয়ে তাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোপসেকে তদন্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার একরকম চেষ্টা ছিল, বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে তথ্যগুলোকে সাজিয়ে নেওয়া— এটা ‘বাদশাহী আংটি’তে প্রথম শুরু হয়, তারপর ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’, ‘সোনার কেল্লা’, ‘সমাদ্দারের চাবি’ ইত্যাদিতে চলতে থাকে। তোপসেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জড়িয়ে নেওয়া মানেই পাঠকেও তদন্তে টেনে আনা। কিন্তু এখানেও সেই একই ব্যাপার, প্রাথমিক তথ্যগুলোই শুধু আলোচনা করা হচ্ছে, রহস্যের গভীরে ঢোকা হচ্ছে না। এখন রহস্য গল্পের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাকৃত তথ্যগোপন হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, কিন্তু কতখানি পাঠককে জানানো হচ্ছে তার ওপর লেখার মান অধিকাংশ ক্ষেত্র নির্ভর করে।

ভ্যান ডাইনের গোয়েন্দা গল্প লেখার কুড়িটি সূত্রের (Twenty rules for writing detective stories) প্রথম সূত্রটিই ছিল:

> রহস্যের সমাধানে গোয়েন্দার সমান সুযোগ দিতে হবে পাঠকেও।গোয়েন্দার চোখে পঞ্জা সূত্রগুলো পাঠকের চোখের আঞ্জালে রাখা যাবে না।[১০]

এই সূত্রের বিচারে ফেলুদার গল্প যে কোনোভাবেই পাস মার্ক পাবে না, তা বলাই বাহুল্য। এখানে ফেলুদার থেকে লেখকের দায় বেশি। তিনি যেভাবে গল্পকে সাজিয়েছেন, চরিত্র তার অনুগত হয়েছে। কিন্তু ফেলুদাকে অতিমাত্রায় সাজাতে গিয়ে গল্পে অতিরঞ্জিত অংশের সংখ্যা বেড়েছে, যা আখেরে ক্ষতি করেছে ফেলুমিত্তিরের

বুদ্ধিদীপ্ত ইমেজের। দুর্বলতার এখানেই শেষ নয়। ফেলুদার কাহিনি জুড়ে জড়িয়ে অজস্র সমাপতন। যখন যাকে চাওয়া হয়েছে, তখনই সে কাহিনিতে হাজির হয়েছে। ধরা যাক, 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'তে ফেলুদারা নেপালের রাজধানীতে সবে পৌঁছেছে, তদন্ত কোথা থেকে শুরু হবে জানা নেই, অথচ যে হোটেলে চেক-ইন করা হল, সেখানেই হাজির অধ্যাপক হরিনাথ চক্রবর্তী, যার ছেলে হিমাদ্রি কাহিনির প্রথম ভিক্টিম, ওর সঙ্গে ফেলুদাদের কোনোরকম এপয়েনমেন্ট করা ছিল না, বস্তুত তার অস্তিত্বই তাদের জানা ছিল না। কিন্তু তিনি আগে থেকেই সেখানে হাজির থাকলেন, এবং তদন্ত সংক্রান্ত অনেকগুলো তথ্য নিয়ে দিয়ে গেলেন। এর থেকেও সাঙঘাতিক আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এ। মূল আসামী শশধর ঘোষ তো কাহিনির গোড়া থেকেই হাজির, তারপর তার ডঃ বৈদ্য সেজে আগমন, প্ল্যানচেট। প্ল্যানচেটের ফলাফলে জানা গেল আসল আসামী হল বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার। এদিকে বীরেন্দ্র তখন হিপি হেলমুট সেজে সেই ঘরেই বসে রয়েছে। শুধু বসেই নেই, সে মূল ঘটনার দিন স্পটে হাজির থেকে পুরো হননকার্যের ছবি তুলে রেখেছে এবং বাকি সবাইকে ছেড়ে সেসব ছবি শুধু ফেলুদাকে এনে দেখাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা প্রাইম সাসপ্যাক্ট মূল সাক্ষী হয়ে দেখা দিচ্ছে।

'হত্যাপুরী'তেও একই ব্যাপার। দুর্গাগতিবাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর এই কাহিনি আর এগোনোর কথা নয়। কিন্তু বিলাস মজুমদার আগবাড়িয়ে এসে আলাপ জমিয়েছে এবং নিজের ও দুর্গাগতিবাবুর সম্পর্কে একগাদা মিথ্যা তথ্য দিয়ে গেছে। বিলাস মজুমদার এভাবে নিজেকে প্রায় একরকম ধরিয়ে না দিলে ফেলুদার পক্ষে কেশ সমাধান করা শক্ত ছিল। 'গোলাপি মুক্তার রহস্য'-এ ফেলুদারা মগনলাল মেঘরাজের পিছু নিয়েছিল কাশী পর্যন্ত মুক্তো উদ্ধারের আশায়। কেউ জানত না তারা কাশী যাচ্ছে কিন্তু রাতের অভিযানের আগে দেখা গেল মতিলাল বড়াল তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। মতিলাল খবর পেল কোথা থেকে ফেলুদারা আসছে? তার দাদা জয়চাঁদও তো এই বিষয়ে কিছুই জানতো না! কিন্তু মতিলাল ঠিক হাজির হয়েছে এবং রাতের অভিযানে অযাচিত লোকবল দিয়ে সাহায্য করেছে। ফেলুদার বাড়িতে কোনোদিনও সিনেমার পত্রিকা রাখা হত বলে জানানো হয়নি, শুধু একটি উপন্যাস ছাড়া, সেটি 'বাক্স রহস্য'। সেখানে দেখা 'তারাবাজি' নামে একটি পত্রিকা তোপসে ওলটাচ্ছে, সেই সংখ্যাতেই অমরকুমার সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সেই অমরকুমারই উপন্যাসের শেষে কালপ্রিট হয়ে দেখা দিচ্ছে। 'সোনার কেল্লা'য় জয়সলমীর যাওয়ার রাস্তায় প্রথমে পেরেক এবং পরে পিনবোর্ড ছড়িয়ে ফেলুদার গাড়ি পাংচার করানো হয়। প্রথম ঘটনা ঘটে ৫৬ মাইলের মাথায়, দ্বিতীয়বার ৯০ মাইলের মাথায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, দুটি ক্ষেত্রেই এই একটি গাড়ির টায়ারই পাংচার হয় কী করে? আপ ডাউন রাস্তা যত নির্জনই হোক অন্য গাড়ি কি চলছিল না? যদি চলে থাকে তাহলে তারা বিপদের কবলে পড়ল না কেন?

'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ নিহত হলেন কাশীর নির্জন গলিতে, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে তার দেখা হয়ে গেল ফেলুদার সঙ্গে, এবং তিনি মৃত্যুর আগে দিয়ে গেলেন মোক্ষম ক্লু— 'সিং... সিং... সিং'। 'বাদশাহী আংটি'তে দেখা যায় ক্রিমিনাল, গোয়েন্দা, সাসপেক্ট সবাই একসঙ্গে ঘুরছে। যেদিন রেসিডেন্সিতে ফেলুদারা ঘুরতে গেল, সেদিন সেখানে বাবু মহাদেবের যাওয়ার দরকার ছিল না। লখনৌয়ের লোক অযথা সকাল সকাল উঠে রেসিডেন্সি দেখতে যাবেই বা কেন? কলকাতার লোক তো রোজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে যায় না। কিন্তু তারা সবাই গেল, এবং কিছু পরেই পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটল। ফেলুদাকে কিছুটা ক্লু পাইয়ে দেওয়ার জন্যই যেন এই পুরো সেটখানা সাজানো হয়েছিল। শুধু ওখানেই নয়, উদ্ধৃত সবকটি ঘটনাই ঘটেছে ফেলুদাকে

সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য এর ফলে ফেলুদার কৃতিত্বই কিছুটা করে কমেছে।

সেই সঙ্গে যোগ করা যায় ফেলুদা চরিত্রের স্ববিরোধিতা। 'বাক্স রহস্য'-এ দেখা যায় ফেলুদা অত্যন্ত সাবধানী। রাত দুপুরে যখন ভুয়ো ফোন এল যে ধামীজার বাক্স পাওয়া গেছে এবং সেটা তুলে নিতে হবে ফোর বাই টু প্রিটোরিয়া স্ট্রিট থেকে, তখন ফেলুদা কোনো রিস্ক নেয়নি, যাচাই করে নিয়েছে আদৌ ওখানে কোনো টেলিফোন নম্বর আছে কিনা। তারপর ভুয়ো বাক্স নিয়ে গিয়ে আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করেছে। অথচ সেই ফেলুদাই 'নেপোলিয়নের চিঠি'তে ঋষিকেশবাবুর কথা শুনে সাবধানতা অবলম্বন না করেই চলে গেছে প্রত্যন্ত মধুমুরলী দিঘির ধারে ভাঙা নীলকুঠির পাশে। পাঠক খুব মজা পেয়েছে হয়তো, কিন্তু ফেলুদার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চাপা থাকেনি। ছদ্মবেশ চেনার ক্ষেত্রেও ফেলুদা খুব তুখোর নন। অন্য তথ্য থেকে কারও কারও আসল পরিচয় টেনে বের করেছে ঠিকই, কিন্তু সামনা-সামনি ধরতে পারেনি। 'বাদশাহী আংটি'তে মহাবীরের সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ, 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এ ডাক্তার বৈদ্য, 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'য় একই লোকের তিনটি ছদ্মবেশ, কোনোক্ষেত্রেই ফেলুদা প্রথম দর্শনে ধরতে সফল হয়নি। বিশেষত বৈদ্য একই টেবিলে বসে দীর্ঘ সময় ধরে প্ল্যানচাঁট করে গেছে, অজস্র উদ্ভট আধ্যাত্মিক বক্তব্য রেখেছে, তবুও তাকে ফেলুদা ধরতে পারেনি। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি যার মূল হাতিয়ার, খুলে রাখা হাতের আংটি দেখে যে রহস্য ভেদ করে, সে আস্ত মানুষটাকে সামনে দেখে চিনতে পারল না, এটাই খটকার।

এ সমস্তই গেল নেতিবাচক দিক। কিন্তু ফেলুদার গোয়েন্দাগিরিতে ইতিবাচক দিকও প্রচুর রয়েছে বেশ কিছু। ইতিপূর্বে বহুল আলোচিত, বিশেষত ফেলুদার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং ভয়হীন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে তো পাঠকমাত্রই পরিচিত। আমরা জানি কীভাবে সামান্য একটা সূত্র থেকে সমাধান খুঁজে বের করে ফেলুদা। 'বাদশাহী আংটি'তে একটা হত্যার রহস্য সমাধান করে দেয় সে। জানা যায় 'স্পাই' মানে চর নয়, আসলে স্পাইডার। অন্যদিকে চৈত্র মাসে হিন্দুদের বিয়ে হয় না, কারণ মলমাস— এই সামান্য সূত্র থেকে 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়ে যায়। স্পটে না থেকে শুধুমাত্র মশলার নেশার প্রসঙ্গ শুনে খুনের কালপ্রিটকে চিহ্নিত করা যায় 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা'য়।

আফ্রিকার রাজা মানে দুর্গাপ্রতিমার সিংহ, আর সেই সিংহের মুখের ভিতরে লুকানো আছে গণেশের মূর্তি, তা ফেলুদার বুদ্ধি ছাড়া বোঝা যায় না। 'সমাদ্দারের চাবি'তে 'আমার নামে চাবি' যে কার্যত ধরণীধরের নিজের নামের শুদ্ধ সাংগীতিক স্বর, তা ফেলুদা ছাড়া আর কেই-বা ধরতে পারে? 'শিয়াল দেবতা রহস্য'তে দেওয়ালে বাচ্চার হাতের ছাপ, কিন্তু তাতে অনেক বেশি রেখা, সুতরাং সে যে আসলে বাচ্চা নয়, একজন বামন, তা বোঝা তোপসের সাধ্যে কুলোয় না, কিন্তু ফেলুদা ঠিক ধরতে পারে। 'নেপোলিয়নের চিঠি'তে আসামী সাধন দস্তিদার পালিয়েছে কিন্তু কীভাবে পালাল কেউ দেখতে পেল না। ফেলুদা ছাড়া আর কে বুঝবে যে লোকটা পালায়নি, আছে; অন্য নামে ভিন্ন পরিচয়ে। এভাবেই একের পর এক তাক লাগানো সমাধান করে গেছে ফেলুদা। কার্যত ফেলুদার নিজস্বতা লুকিয়ে আছে অত্যন্ত মৌলিক পর্যবেক্ষণশক্তির মধ্যে। কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে বলা যায়, এই ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কোনো বেসরকারি গোয়েন্দার নেই।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য গোয়েন্দাদের সঙ্গে ফেলুদার একটি বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে যে ফেলুদার পড়াশোনা। পড়াশুনোই ফেলুদাকে বাঁধা ছকের বাইরে চিনতে সাহায্য করে। খুব কম গোয়েন্দাকেই আমরা বাংলা সাহিত্যে দেখি পড়াশোনা করে গোয়েন্দাগিরি করছেন, ব্যোমকেশকেও আমরা আলাদা করে পড়াশোনা করতে দেখি না,

সে তার ছেলের 'আবোল তাবোল' নিয়ে টানাটানি করত। শার্লক হোমসের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যায়, কিন্তু ফেলুদা এখানে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর কাহিনির মধ্য দিয়েই সত্যজিৎ এই কথা পাঠককে জানিয়েছেন যে ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি শিখেছে বিদেশি ডিটেকটিভ গল্প পড়ে। তবে ফেলুদার পড়াশুনো কেবল ডিটেকটিভ গল্প পড়ার মধ্যেই সীমিত নয়। বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ছাড়াও রান্নার বই পড়তেও তাঁকে দেখা গেছে। সাহিত্য থেকে স্থাপত্য, খেলাধুলা থেকে সংখ্যাতত্ত্ব, কলকাতার ইতিহাস থেকে জ্যামিতি, বিভূতিভূষণ থেকে কালীপ্রসন্ন, কী নেই সেই পাঠের তালিকায়। আসলে এই সমস্ত অভ্যাসই সত্যজিতের নিজের মধ্যে ছিল, তাই তিনি ফেলুদার চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

দিনের পর দিন ফেলুদা এশিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে পড়াশোনা করেছে। বিশ বছরের পুরোনো পুথিপত্র ঘাটাঘাটি করত, কলকাতার ম্যাপ নিয়ে তার জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। সিধুজ্যাঠার মতো ফেলুদার জ্ঞানের পরিধিও কম নয়। নিতান্ত অপরিচিত প্রসঙ্গ উঠলেও আন্দাজ করে ফেলতে পারে ঠিক। এর পরিচয় পাওয়া যায়, 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী চিনিয়ে দিয়েছে রিংমাস্টার বীরেন কারান্ডিকারকে, আর 'রবার্টসনের রুবি'তে ইন্সপেক্টর চৌবের পূর্বপুরুষের হদিশ মিলেছে পাদরি প্রিচার্ডের বই থেকে। এই অগাধ পড়াশোনাই এক আলাদা বৌদ্ধিক মাত্রা এনে দিয়েছে ফেলুদার চরিত্রে— যা বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী গোয়েন্দাদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত।

এই পড়াশোনাই ফেলুদাকে যুক্তিনির্ভর ও তর্কপ্রিয় করে তুলেছিল। তাই বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুতুড়ে ঘটনায় তার অবিশ্বাস। তবে এই অবিশ্বাসের মধ্যে কোথাও কোনো উগ্রতা বা অসহিষ্ণুতা নেই, বরং যুক্তি দিয়ে বিচারের চেষ্টা আছে। গল্পের প্রয়োজনে কাহিনিতে অনেকগুলোই অলৌকিক বিষয় এসেছে, ফেলুদা কোনো ক্ষেত্রেই বাধা দেননি। কিন্তু সেই সমস্ত ভৌতিক ঘটনার মধ্যে কোথাও যদি অযৌক্তিক কিছু দেখেছেন, তখনই প্রতিবাদ করেছেন। সিরিজে অন্তত তিনটি কাহিনিতে প্ল্যানচ্যাটের ঘটনা রয়েছে। 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'গোসাইপুর সরগরম', 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর', 'গোরস্থানে সাবধান'। 'হত্যাপুরী'তে লক্ষণবাবুর আজগুবি কথা ফেলুদা হাতে-নাতে ধরেছে। মেচেদার সংখ্যাতাত্ত্বিক ভবেশ ভট্টাচার্যের কাছে যাওয়া নিয়ে জটায়ুকে ঠাট্টা করেছে, কাশীতে 'মাছলি বাবা'র নাটক ভেঙে দিয়েছে, গ্যাংটকে নকল ড. বৈদ্যের চেহারা বের করে এনেছে শশধর বোসকে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ গুরু মুক্তানন্দের প্রসঙ্গ এসেছে, বলা হয়েছে তার পেছনে নাকি কাজ করে চলেছে তিন মহাদেশের শক্তি। ফেলুদা শেষে খুঁজে বের করেছে যে 'শক্তি' মানে অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বরং তিন মহাদেশের ডাকটিকিট মাত্র। তবে এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে 'গোঁসাইপুর সরগরম', সেখানে ভূত বিশারদ মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য প্ল্যানচ্যাট করে লোকজনকে চমকে দিচ্ছে। শুধু চমকেই নয় নিয়মিত ভন্ডামিও করে চলেছে। এটা বুঝেই রীতিমতো পরিকল্পনা কষে তার মুখোশ খুলে দেয় ফেলুদা। তুলনায় ব্যোমকেশের এসব অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস বেশি। 'শৈল রহস্য' গল্পে তো স্বয়ং ভূতকে এনেও হাজির করেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্র

১. সুকুমার সেন, 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', কলকাতা: আনন্দ, ২০১৫, পৃ. ১৩৫।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', একাদশ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯০, পৃ. ৩১৪।

৩. শহর কলকাতার ক্রাইমের এই সাদামাটা চরিত্রের সমর্থন মেলে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ঔপনিবেশিক কলকাতায় ঘটে যাওয়া বিবিধ অপরাধের ইতিবৃত্ত ও তাদের চরিত্র সম্পর্কে অনুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন সুমন্তবাবু। তিনিও যে খতিয়ান দিচ্ছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু মোটা দাগের ক্রাইম; যেমন, খুন-ডাকাতি-নারী পাচার-টাকা নকল ইত্যাদির বাইরে বুদ্ধিদীপ্ত অপরাধের নমুনা কলকাতায় প্রায় মেলে না। তা বলে, এমন নয় যে কলকাতা অপরাধ-বিমুখ বা অনিচ্ছুক, বরং চুরিচামারি-লুঠতরাজে বিলক্ষণ আগ্রহ দেখা যায় এক শ্রেণির অপরাধীরদের মধ্যে। বিশেষত চিৎপুর, কালীঘাট ইত্যাদি জনবিরল জায়গাগুলি তো অপরাধের মুক্তাঞ্চল ছিল। সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে এই সব জায়গায় পা রাখত না সাধারণ মানুষ। দ্রষ্টব্য, Sumanta Banerjee, *Wicked City Crime and Punishment in Colonial Calcutta*, Kolkata: Orient Blackswan, 2009, p. 17-18.

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ভূমিকা অংশ।

৬. পুরোনো বাড়ির বিবরণ ফেলুদা-সিরিজে প্রচুর রয়েছে। কৈলাস চৌধুরীর পাথর, গোলকধাম রহস্য, বাক্স-রহস্য, টিনটোরেটোর যীশু, রয়েল বেঙ্গল রহস্য, গোরস্থানে সাবধান, গোঁসাইপুর সরগরম, ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা ইত্যাদি কাহিনিতে বিভিন্ন রকম বাড়ির কথা পাওয়া যায়।

৭. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিতের সাক্ষাৎকার, 'দেশ', বর্ষ ৫৪, সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ৩৭।

৮. সত্যজিৎ রায়, 'ফেলুদা সমগ্র', প্রথম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫, পৃ. ৬৪৪।

৯. "ব্যোমকেশকে অনেক জটিল রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিতে দেখিয়াছি ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান পদ্ধতিও এতদিন একসঙ্গে থাকায় অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছে। তাই মনে মনে ভাবিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিব না? বিশেষ, আমার প্রতি মোহনের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটা জিদও চাপিয়াছিল, যেমন করিয়া পারি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিব।" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

১০. https://framandkar.wordpress.com/2011/06/13/twenty-rules-for-writing-detective-stories-by-s-s-van-dine.

# বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দীপশিখা দাস

সারসংক্ষেপ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে প্রায় চারশোর কাছাকাছি ছোটোগল্প লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পই বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে লেখা। সাধারণ নরনারীর আশা-নৈরাশ্য, প্রেম-অপ্রেম, ঈর্ষা-ঘৃণা ইত্যাদি মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই ছিল গল্পগুলোর মূল কথা। বাংলা ছোটোগল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর যথাযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'যযাতি', 'চোর', 'চাঁদমিঞা', 'সেতার', 'রস', 'টিকেট', 'যৌথ', 'মহাশ্বেতা', 'ঘাম' ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করা যায়।

মনস্তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিশ শতকের শুরুতে, বিশেষ করে অস্ট্রিয় মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের লেখা 'The Interpretation of Dreams' এবং 'Psychopathology of Everyday Life' গ্রন্থ দুটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ধীরে ধীরে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সচেতন ও সার্থক লেখক। আবার বাংলা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক গল্পেরও সূত্রপাত তাঁর লেখনীর দ্বারাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'নষ্টনীড়' (১৯০১) গল্পের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্পের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালীন সময়ে কোনো কোনো গল্পকারের গল্পে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা।

---

**দীপশিখা দাস:** বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৮২-৯৬

বিশ শতকের কুড়ির দশকে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ঘটনা হল 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা ফ্রয়েডের চেতন মনের অন্তরালে সক্রিয় অবচেতন ও অচেতন মন-সম্পর্কিত তত্ত্বকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশেষ করে যৌন-মনস্তত্ত্ব তাঁদের ছোটোগল্প-উপন্যাসে প্রধান হয়ে ওঠে। এই কল্লোলপন্থীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। তাছাড়া আরও অসংখ্য গল্পকার সেই সময়ে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখালেন। এই গল্পকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ। বিশ শতকের কুড়ির দশকে বাংলা ছোটোগল্পে আরও অনেক গল্পকারের আবির্ভাব হল যাঁদের মধ্যে অনেকেই মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্প রচনা করলেন, আবার কারও কারও গল্পে মনস্তত্ত্ব অনুষঙ্গ হিসেবে এল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে একদল তরুণ বাঙালি লেখক মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প রচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। এই লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর ছোটোগল্পে চরিত্রের মনোগহনের জটিলতা উদ্‌ঘাটনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'যযাতি', 'চোর', 'চাঁদমিঞা', 'সেতার', 'রস', প্রভৃতি গল্পে চরিত্রের মনঃসমীক্ষণ করা হয়েছে। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কখনো নিজের বাস্তববুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। এভাবেই তিনি বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্পের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বীজশব্দ: অকল্লোলীয় লেখক, কল্লোলগোষ্ঠী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাশিল্পী। তিনি প্রধানত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের রূপকার। গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য গল্পের বিষয়বস্তুর সাধারণত্ব। তবে সেই সাধারণত্বের মধ্য থেকে অসাধারণত্বের উন্মোচনে, চেনাজগতের মধ্য থেকে অচেনা রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি অসাধারণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা ছোটোগল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারার অন্যতম সার্থক শিল্পী। নরনারীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্লোক আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি হৃদয়ের জটিলতার নিপুণ বিশ্লেষক। তাঁর রচিত মনস্তত্ত্বপ্রধান কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হবে। তবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক গল্প আলোচনা করার আগে মনস্তত্ত্ব এবং বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নিতে হয়।

মনস্তত্ত্ব আধুনিক জীবনে বহুচর্চিত এক বিষয়। বাইরের ঘটনা মানুষের হৃদয়ে যে সমস্ত নিগূঢ় অনুভূতি জাগায় এবং যার ফলে মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয়, তার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের নামই হল মনস্তত্ত্ব। মনস্তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিশ শতকের সূচনালগ্নে, বিশেষ করে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের দুটি বই 'The Interpretation of Dreams' (১৮৯৯) এবং 'Psychopathology of Everyday

Life' (১৮৯৭)-এর ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হলে। বিশ শতকের চিন্তাজগতে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা মনের গোপন রাজ্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। ফলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ধীরে ধীরে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, পত্রপত্রিকা প্রভৃতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কথাসাহিত্য সঠিক রূপ পরিগ্রহণে সচেষ্ট হলেও তাতে মনোবিশ্লেষণরীতির যথার্থ সূক্ষ্ম প্রয়োগ বিশ শতকের গোড়া থেকেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'নষ্টনীড়'(১৯০১) এবং 'চোখের বালি'(১৯০৩)-র দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক গল্পেরও জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্পে বাইরের ঘটনার চেয়ে মনোবিশ্লেষণই বড় হয়ে উঠেছে। এর বিষয়বস্তু স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় সম্পর্কের টানাপোড়েন তথা অসামাজিক প্রেম। সংবাদপত্রের সম্পাদক ভূপতি এবং বালিকাবধূ চারুলতার মধ্যে ছিল ব্যবধান, শুধু বয়সের নয়, মনোজগতেরও। নানা কর্মব্যস্ততার দরুন ভূপতি চারুকে সবসময় এড়িয়ে গেছে। তার এই ঔদাসীন্য চারুর জীবনে শূন্যতা ও একাকিত্ব নিয়ে আসে। এই শূন্যতার ফাঁক দিয়েই চারুর হৃদয়ে অমলের আবির্ভাব। চারু ও অমলের সম্পর্ক ছিল বউদি ও দেওরের। কিন্তু ধীরে ধীরে দুটি সমবয়স্ক ও সমমনস্ক মানুষের মধ্যে একটি সখ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে চারুর হৃদয়ে যে শূন্যস্থান ছিল, তা পূরণ হয়। অবশেষে চারু ও অমলের নিবিড় সান্নিধ্যের রন্ধ্রপথে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রেম এসে প্রবেশ করে। প্রেমের সেই সর্বগ্রাসী প্রভাবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা চারুর ছিল না। সে ভালোবাসার অগ্নিশিখায় দগ্ধ হতে লাগল। অমল এই প্রেমের ধ্বংসকারী পরিণতির আশঙ্কা করে বিয়ের অছিলায় বিদেশে পাড়ি দিল। ফলে চারুর তখন বিরহ-জর্জরিত করুণ অবস্থা। এদিকে ভূপতি ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হয়ে যখন স্ত্রীর কাছে ফিরতে চাইল, তখন দেখতে পেল চারুর হৃদয়-সিংহাসনে অমল সম্রাটরূপে আসীন। ফলে স্ত্রীর কাছ থেকে সে দূরে মৈশুরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বিদায় নেওয়ার সময় চারু সঙ্গে যেতে চাইলে ভূপতি অস্বীকার করল। আসলে চারু যে তার সঙ্গকামনার পরিবর্তে অমলের স্মৃতিবেষ্টিত গৃহত্যাগে উদ্যত, সেই অনুভবের বেদনায় সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে অস্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ভূপতি-চারু-অমলের ত্রিকোণ সম্পর্ককে মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। 'নষ্টনীড়' এক অসাধারণ মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প। এই গল্প প্রসঙ্গে সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর উক্তি: "এখান থেকেই বাংলা ছোটগল্পে মনোবিকলনাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান-এষণাময় জীবন-চিন্তার অগ্রসৃতি।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকাল থেকে যে সকল লেখক বাংলা ছোটোগল্পের পরিচর্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু প্রমুখ। এঁদের গল্পে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিশ্লেষণের রীতিটি ধরা পড়েনি। তবে এই গল্পকারদের কোনো কোনো গল্পে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কুড়ানো মেয়ে', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কাশীনাথ', রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের 'জাবালি' প্রভৃতি।

বিশ শতকের কুড়ির দশকে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ঘটনা হল 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। 'কল্লোল'-এর পর 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমেও সেদিনকার লেখকেরা আধুনিক ভাবধারার প্রসার ঘটান।

প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা হল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব। ফ্রয়েডের চেতন মনের অন্তরালে সক্রিয় অবচেতন ও অচেতন মন-সম্পর্কিত তত্ত্বকে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং সাহিত্যে তা প্রয়োগ করতে তৎপর হন। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশেষ করে যৌন-মনস্তত্ত্ব তাঁদের ছোটোগল্প-উপন্যাসে প্রধান হয়ে ওঠে। এই কল্লোলপন্থীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। এঁরা এবং অন্যান্য কল্লোলীয় লেখকেরা ফ্রয়েডের মনোবিকলনের প্রভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিশ্লেষণ নিয়ে এলেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ইতি', 'অরণ্য', 'অমর কবিতা' ইত্যাদি গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 'ইতি' গল্প প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী বলেছিলেন: "'ইতি'-তে গল্প-শিল্পী অচিন্ত্যকুমারের নবজন্ম হল 'যৌনবৃত্ত' থেকে মনস্তাত্ত্বিক জীবন-সন্দর্শনের বৃত্তলোকে,— এইটুকুই বুঝি শিল্পীর নিজের ইঙ্গিত।"[২]

এই গল্পের বিষয়বস্তু এক বারবনিতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বড়দিনের ছুটিতে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে অভিনয় করতে। রাজপুত্র হিরণকুমারের চরিত্রে অভিনয় করবে তরুণ যুবক নিমাই, আর রাজকুমারী মালতী-চরিত্রে চমৎকারিণী দাসী। কিন্তু অভিনয়ের আগে চমৎকারিণী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন বেশ্যাপাড়া থেকে সহজলভ্য সরলাকে তার জায়গায় নিয়ে আসা হয়। প্রণয়-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মালতীরূপিণী সরলা হিরণকুমারবেশী নিমাইয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। দু-তিন রাত ধরে অভিনয় ও অভিনয়ের বাইরে নিমাইয়ের স্বল্পকালীন উষ্ণ সান্নিধ্যে সরলার জীবন যেন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। সে ভুলে যায় তার নোংরা, ঘৃণ্য, বন্দী জীবন। এদিকে সরলা যার টাকায় বাঁধা সেই অটলবাবু এসে আক্রোশে ফিরে যায় রাতের পর রাত। কিন্তু এক চরম মুহূর্তে সরলার স্বপ্নের জগৎ হঠাৎ ভেঙে পড়ে। অভিনয়ের দিন সকালে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে চমৎকারিণী সুস্থ হয়ে ওঠায় অভিনয়টা সে-ই করবে। অতএব তাকে আর প্রয়োজন নেই। অভিমানে, হতাশায় মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ে সরলার বিবর্ণ জীবন। তবুও শেষ আশায় ভর করে গভীর রাতে সরলা নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য থিয়েটারের তাঁবুতে পৌঁছে যায়। কিন্তু ততক্ষণে অভিনয় শুরু হয়ে যায়। অভিনয় যখন ভাঙে তখন জনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শিল্পীরা আনন্দিত হয়ে ওঠে। আশাহত সরলা আর সেখানে অপেক্ষা না করে বাড়ি ফিরে আসে। পরদিন নিজের ঘরে তার যখন জ্ঞান ফেরে, তখন তার সারা গায়ে ভীষণ জ্বর, ব্যথা ও ক্লান্তি। আগের দিন রাতে নেশাগ্রস্ত অটলবাবুর বিষম প্রহারে তার এই অবস্থা। কিন্তু এত যন্ত্রণার মধ্যেও সে কল্পনা করে হিরণকুমাররূপী নিমাই আসছে। এই গল্পের সরলা চরিত্রে গল্পকার অবচেতন মনের বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়তো', 'শৃঙ্খল', 'স্টোভ' ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের গল্প। 'হয়তো' গল্পটিতে

মানবচরিত্রের এক জটিল মনস্তত্ত্ব অঙ্কিত হয়েছে। লাবণ্যের দাম্পত্য-জীবনের সূত্রপাত জীর্ণ অট্টালিকার একটি ঘরে। নিয়োগী বংশের শেষ বংশধর মহিম তার স্বামী হলেও রাতে শয়নগৃহে প্রবেশের সময় তার যেন ভয় করে। মহিমের অস্থির আচরণ লাবণ্যের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। লাবণ্যের উপস্থিতির প্রতি মহিমের নীরব ঔদাসীন্যে লাবণ্য যখন আহত, ঠিক তখনই সে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে জিজ্ঞাসা করে, তাকে লাবণ্যের পছন্দ হয়েছে কি না। যখন লাবণ্য এই প্রশ্নে সায় দেয়, ঠিক তখনই মহিম উগ্রমূর্তি ধরে বলে যে, মেয়েদের সকল পুরুষকেই এত তাড়াতাড়ি পছন্দ হয়ে যায়। আবার পরক্ষণেই সে শান্তমূর্তি ধারণ করে। কোনো কোনো সময় গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেতেই লাবণ্য দেখে যে মহিম তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই গল্পে মহিম বিকৃত মানসিকতার, বিকৃত স্বভাবের এক পুরুষ। স্ত্রীর প্রতি চরম সন্দেহে সে তাকে রোজ ঘরবন্দী করে রাখে। লাবণ্য মহিমের সম্পর্কিত বোন মাধুরীকেও বুঝতে পারে না। তবে মাধুরীর কাছ থেকেই সে জানতে পারে সাতপুরুষ ধরে এ বাড়ির পুরুষ-কর্তৃক মেয়েদের লাঞ্ছনার কথা। মহিমের বৃদ্ধা পিসি এই বাড়ির সাতপুরুষের ধন যক্ষের মতো রক্ষা করেন। সেই বিপুল ধনসম্পদ একদিন লাবণ্য আবিষ্কার করে মাধুরীর সাহায্যে। তার পরিণতি হয় ভয়ংকর। এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে মহিম পোল থেকে লাবণ্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু লাবণ্য ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। আসলে এই গল্পে মহিমের মধ্যে দ্বৈতসত্তা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। পূর্বপুরুষকৃত অপরাধ তার মনের গহনে পাপবোধ হিসেবে কাজ করেছে। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে লাবণ্যের প্রতি অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখনই সে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে বেরিয়েছে তখন সে স্বাভাবিক হয়েছে। সে লাবণ্যের ভালোবাসায় মুক্তি খুঁজতে চেয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার আগের মতো হয়ে গেছে। নারীর ভালোবাসাকে সে বিশ্বাস করতে চায়নি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় মহিম চরিত্রটি দ্বিধা-জর্জরিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে সুনিপুণভাবে জটিল মনস্তত্ত্ব অঙ্কন করেছেন। জনৈক সমালোচক বলেছেন:

> 'হয়তো' গল্পটি জটিল।... চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে, বিশেষত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মহিমের দ্বৈতসত্তার কমপ্লেক্স চিত্রণে, সিচ্যুয়েশন সৃষ্টির অনবদ্য নৈপুণ্যে, বর্ণনার ঐশ্বর্যে এ গল্প এককথায় অনবদ্য।[৩]

বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা', 'এমিলিয়ার প্রেম', 'জ্বর' ইত্যাদি গল্পে মনস্তত্ত্বের নিপুণ প্রয়োগ রয়েছে। 'রজনী হল উতলা' গল্পে লেখক নরনারীর দুর্নিবার আসঙ্গ-প্রবৃত্তির উন্মাদনা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন। গল্পের সূচনা মেঘনা নদীর বুকে ভাসমান এক স্টিমারে। গল্পকথক-নায়ক সেখানে স্টিমারের ডেকে বসে তার ভাবী স্ত্রী নীলিমার সঙ্গে কথোপকথনরত। কথায়-কথায় উঠে আসে নায়কের অতীত জীবনের কথা। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ এই নায়ক কলকাতায় এসে পিতৃবন্ধু এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে বিভিন্ন বয়সী ফুলের মতো কোমল সুন্দরীদের প্রতি সে যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। সেই অল্পবয়সী মেয়েরাও নবাগত যুবককে নানা গোপন ইঙ্গিত দিয়ে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। তারপর দেখা যায় নায়ক সেই বাড়ির কোনো এক অজ্ঞাতনামা কন্যার সঙ্গে প্রত্যেক রাতে শরীরী খেলায় মেতে ওঠে। সে সেই সুন্দরীর শরীরের প্রতিটি স্পর্শ নিজের শরীর দিয়ে অনুভব করে। সম্ভোগের পর দেখা যায় নায়কের অবসাদ এসেছে এবং

রাতের অন্ধকারে সেই নারীর পরিচয় জানবার জন্য সে আগ্রহী হয়েছে। এরপর অবস্থা এমন হয় যে, দিনের বেলাকার নায়কের সত্তা রাতের অন্ধকারে গোপন অভিসারের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এই দৈহিক সম্ভোগের স্মৃতিচারণ নায়কের অতীতকেই শুধু ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে না, ধীরে ধীরে বর্তমান জীবনের ওপরও তার ছায়াপাত ঘটে। তবে গল্পের শেষে কামনার সেই অন্ধকার থেকে প্রেমকে আলোকে আনবার জন্য নায়ক তার নায়িকা নীলিমার হাত ধরেছে। এই গল্পে লাগামহীন যৌন-আকাঙ্ক্ষার মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয়েছে। সমালোচক দেবকুমার বসু বলেছেন: "যৌন জীবনে দেহ ও মনের, কাম ও কামনার, সম্ভোগ ও প্রেমের দ্বৈত সম্পর্ককে গল্পকার এই গল্পে গুরুত্ব দান করেছেন।"[৪]

অচিন্ত্যকুমার-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব ছাড়াও কল্লোলীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ আরও অসংখ্য গল্পকার সেদিন মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বিশেষত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখালেন এবং নিজেদের গল্পে তা ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হলেন। এই গল্পকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ।

জগদীশ গুপ্তের 'আদি কথার একটি', 'চন্দ্র সূর্য যতদিন', 'পয়োমুখম' ইত্যাদি গল্প মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপাদানে ভরপুর। 'আদি কথার একটি' গল্প প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন:

> জগদীশ গুপ্ত নারীর যৌন মনস্তত্ত্বের গভীরে আলোকপাত ক'রে অতলতল নারী কামনার বহিঃপ্রকাশ পূর্ণাবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন আদি কথার একটি গল্পে।... নরনারীর মনের গতির পরিচয় মনঃসমীক্ষণের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন জগদীশ গুপ্ত।[৫]

এই গল্পে যৌন প্রবৃত্তির টানাপোড়েন উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত দাসপাড়ায় পাশাপাশি বাস গোপাল দাসের পরিবার ও সুবল দাসের। গোপাল দাসের স্ত্রী কাঞ্চন অসাধারণ সুন্দরী যুবতী। তাদের দুটি কন্যাসন্তানের মধ্যে প্রথমটির বিয়ে দিয়ে গোপাল দাসের মৃত্যু হয়। ছোটো মেয়ে খুশির বয়স পাঁচ বছর। সুবল তেইশ-চব্বিশ বছরের সুপুরুষ, অবস্থাপন্ন যুবক। সে তার প্রতিবেশিনী অসহায় বিধবা কাঞ্চনকে সাহায্য করবার জন্য খুশিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। বয়সের ব্যবধানের জন্য কাঞ্চনের মন খুঁতখুঁত করলেও সুযোগ্য পাত্র সুবলকে সম্মতি জানাতে সে দেরি করে না। যথাসময়ে খুশির সঙ্গে সুবলের বিয়ে হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সুবলের অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। সুবল খুশিকে বিয়ে করেছিল যুবতী শাশুড়ি কাঞ্চনকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আশায়। খুশি ছিল উপলক্ষ, সুবলের আসল লক্ষ্য কাঞ্চন। তাই একদিন সুবল কোমরে চোট পেলে কাঞ্চন যখন তার কোমরে তেল মালিশ করে, সুবল তখন কাঞ্চনের হাত ধরে ফেলে। আসলে কোমরের ব্যথার অজুহাতে সুবল কাঞ্চনকে কাছে পেতে চেয়েছিল। এদিকে কাঞ্চন জামাতাকে ধাক্কা মেরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তার তৃষিত দেহের গোপন কামনার অনুভূতি সে নিজের দেহেই অনুভব করে। খুশির সঙ্গে সুবল প্রথমদিকে ভালো ব্যবহার করলেও পরে শাশুড়ি কর্তৃক প্রত্যাখ্যানজনিত তার রোষ গিয়ে পড়ে খুশির ওপরই। খুশির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, সুবলের যৌন ক্ষুধা এবং নিজের গোপন কামনার কথা চিন্তা করে কাঞ্চনের হৃদয় অন্তর্দাহে জ্বলতে থাকে। এদিকে সুবলকে নিজের থেকে দূর করে দিলেও কাঞ্চনের প্রতিটি রোমকূপ সুবলের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকে। একদিকে মেয়ের মঙ্গলকামনা এবং অন্যদিকে

নিজের উপবাসী শরীরের প্রবল তৃষ্ণা— এই দোটানায় কাঞ্চন চরিত্রটি দ্বিধাবিভক্ত। কী করে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করবে, সেইসঙ্গে নিজেকে ও নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎকে সেই কামার্ত পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করবে, সেই চিন্তায় কাঞ্চন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সুবল কাঞ্চনের অতৃপ্ত দেহজ কামনার কথা বুঝতে পেরেছে। ফলে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং একদিন সেই সুযোগ পেয়েও যায়। কাঞ্চন তখন অসুস্থ অবস্থায় ঘরে শায়িত। সুবল কাঞ্চনের ঘরে ঢুকে পড়ে এবং কাঞ্চনের বারবার প্রত্যাখ্যানের পরও সে পশুর মতো তাকে ভোগ করে। 'আদি কথার একটি' গল্পে নারীর যৌন মনস্তত্ত্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কাঞ্চনের মানসিক জটিলতা উদ্‌ঘাটনে গল্পকার এখানে মনস্তত্ত্ববিদের মতোই পরিচয় দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি সুবলেরও মানসিক বিকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

যুবনাশ্ব ছদ্মনামে মনীশ ঘটক অন্ধকার বিভীষিকাময় জগতের বাসিন্দাদের নিয়ে ছোটোগল্প রচনা করেছেন। তাঁর 'পটলডাঙার পাঁচালী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কালনেমি', 'মন্থশেষ', 'ভূখা ভগবান', 'রাতবিরেতে' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কালনেমি' গল্পে জীবনের অন্ধকার দিকটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। এই গল্পের নায়ক ডাকু জোয়ান পুরুষ এবং তার স্ত্রী ময়না যুবতী। ডাকুর পা রেলে কাটা পড়ায় সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে তাকে ভিক্ষা করতে হয়। ফলে পটলডাঙার খেঁদিপিসির আস্তানায় তারা আশ্রয়লাভ করে। কিন্তু পটলডাঙার নারকীয় পরিবেশে তারা দেখে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কোনো মর্যাদা নেই। নারীরও নিরাপত্তা নেই। একবার বস্তির বাসিন্দা রতন ময়নার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করলে ময়না ঘুষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দেয়। ফলে প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলতে থাকে রতন। শেষ পর্যন্ত রতন ও অন্য যুবকদের পাশবিক লালসার শিকার হতে হয় অসহায় ময়নাকে। অত্যাচারিতা ময়না যখন শোকে ম্রিয়মাণ, তখন খেঁদিপিসি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, পেট চালাবার জন্য যখন পথে বের হতেই হবে, তখন আর স্বামী-স্ত্রীর ভড়ং করে লাভ নেই। যুবনাশ্ব মানবীয় মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় দেখিয়েছেন গল্পের একেবারে শেষে ডাকুর অমানবিক আচরণের মধ্য দিয়ে। ধর্ষিতা স্ত্রী ময়নার জন্য সমব্যথী হওয়ার পরিবর্তে ডাকু ময়নার সেই দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাকে ভোগ করতে চেয়েছে। গল্পকার ডাকুর যৌন মনস্তত্ত্ব অল্পকথায় খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন: "তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভূখের (sic) জ্বালা! মত্ত পশুর মতো দু'চোখ জ্বলছে।"[৬]

স্ত্রীর ওপর এতবড় পাশবিক নির্যাতন তার কাছে কোনো গুরুত্ব পায়নি। ফলে ময়নার পথে এসে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য ময়নার এই সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছে স্বামীর প্রতি ভীষণ অভিমান। এদিকে ডাকু ময়নার সতীত্ব বিক্রয়ের বিনিময়ে কোনোমতে দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে টিকে থাকতে চেয়েছে। এই গল্পে ডাকু ও ময়না এই দুটি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাখনির পটভূমিতে লেখা গল্প নিয়েই বাংলা ছোটোগল্প সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন। তাঁর অজস্র গল্প 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এর পাতায় প্রকাশিত হলেও তিনি ঠিক কল্লোলীয় ছিলেন না। তবে তাঁর গল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের রসদ প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁর 'নারীর মন', 'মা', 'নারীমেধ' প্রভৃতি গল্পে সাঁওতাল নরনারীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। 'নারীর মন' গল্পের

বিষয়বস্তু ত্রিকোণ প্রেম। এক পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই বোনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা আর অভিমান সর্বোপরি এই তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্য দিয়ে চিত্রিত। সাঁওতাল যুবতী ভুলি পীরু মাঝির স্ত্রী। কিন্তু ভুলির অবিবাহিতা বোন টুরনীর প্রতি পীরু আকৃষ্ট হয়। টুরনীর মনেও আকর্ষণ জেগে ওঠে দিদির স্বামীর প্রতি। এই গোপন প্রণয় ভুলির কাছে গোপন থাকে না। ফলে সে অপমানিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। বাসন্তী পূজার মেলায় পীরু ও টুরনীর ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ ভুলি বোনকে প্রহার করে। এদিকে পীরু প্রহাররতা ভুলির গায়ে লাথি মেরে তাকে চরম অপমান করে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নানা চেষ্টা করে এমনকী পীরুর শত্রুতা সাধন করেও সে পীরুকে ফেরাতে পারে না। আবার দেখা যায়, যে বোনের ওপর ভুলির এত রাগ, সেই টুরনীর অসমের চা-বাগানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে ভুলির মন বোনের প্রতি মমতায় বিগলিত হয়েছে। নারীহৃদয়ের এই পরিবর্তন মনস্তত্ত্বের আলোকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বোনের প্রতি মমতায় এবং স্বামীর প্রতি অভিমানে ভুলি আড়কাঠির দলের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে অচেনা চা-বাগানের উদ্দেশে রওনা দেয়। ভুলি নিজের স্বামীকে প্রকারান্তরে নিজের বোনের হাতেই তুলে দেয়। এদিকে টুরনী পলাশবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে স্টেশন অভিমুখে আসতে থাকে। ভুলি প্রাণ ভরে একবার বোনকে দেখে নিয়ে আর্দ্র হৃদয়ে ট্রেনের জানালার একপাশে সরে বসে। ভুলি সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন: "ভুলির মধ্যে শিল্পী সত্যই চিরন্তনী 'নারীর' 'মন'কে খুঁজে পেয়েছেন, — যার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অপার রহস্য 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'!"[৭] ভুলি, পীরু ও টুরনী এই তিনটি চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে গল্পে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রবোধকুমার সান্যালের গল্পসম্ভার গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে। তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা লেখক তাঁর বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে উন্মোচন করেছেন। তাঁর 'অঙ্গার', 'নূপুর', 'প্রেতিনী' ইত্যাদি সেই ধরনেরই গল্প।

কল্লোলগোষ্ঠীর উক্ত লেখক ছাড়াও আরও কয়েকজন কল্লোলীয় ছিলেন, যাঁদের গল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সেদিন প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠেছিল। বিজয় সেনগুপ্তের 'আঁধি', ভূপতি চৌধুরীর 'হিসাবের বাহিরে', রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরস্ত্রী', নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নেশার জের', প্রমথনাথ বিশীর 'সাগরিকা', অহল্যা গুপ্তের 'কল্যাণী', সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পারের খেয়া', দীনেশরঞ্জন দাশের 'বেনামী জিনিস', গোকুলচন্দ্র নাগের 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্বের সুপ্রচুর উপাদান রয়েছে।

বিশ শতকের কুড়ির দশকে বাংলা ছোটোগল্পে আরও অনেক গল্পকারের আবির্ভাব হল, যাঁরা কল্লোলপন্থী না-হয়েও আধুনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা অনেকেই মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্প রচনা করলেন, আবার কারও কারও গল্পে মনস্তত্ত্ব অনুষঙ্গ হিসেবে এল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'ডাকিনী' প্রভৃতি গল্পকে মনস্তত্ত্বধর্মী গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'বেদেনী' গল্পে এক আদিম জৈব প্রবৃত্তিজনিত মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত। রাধিকা বা রাধা বেদেনী স্বৈরিণী। সেই স্বৈরিণী সত্তাই তাকে সবসময় চালিত করেছে। তার সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী এই বেদেনীর কালো রূপ যেন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়। রাধা বেদেনীর

বিয়ে হয়েছিল চোদ্দো বছর বয়সে, শিবপদ বেদের সঙ্গে। বেদেদের মধ্যে শিবপদ ছিল অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এবং কিছুটা শিক্ষিতও। স্ত্রী রাধার সঙ্গেও ছিল তার ভাব-ভালোবাসা। কিন্তু তাদের এই মধুর সম্পর্কে চিড় ধরল শম্ভু বেদের আবির্ভাবে। শম্ভু বাজিকর বাঘের খেলা দেখায়; প্রাণচাঞ্চল্যে সে ভরপুর। শম্ভুর পৌরুষ ও প্রাণচঞ্চলতায় আকৃষ্ট হল রাধা বেদেনী। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সে শিবপদকে ত্যাগ করে তার সঞ্চিত কিছু অর্থ নিয়ে চলে এল শম্ভুর কাছে। তারা একসঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা মেলায় ভোজবাজির খেলা দেখায়। রাধিকাও ছাগল, বাঁদর ও সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে, গান গেয়ে বেড়ায়। ইতিমধ্যে তারা কঙ্কালীর মেলায় এসে উপস্থিত হল। সেই বছর কঙ্কালীর মেলায় দেখা গেল চাকচিক্যে উন্নততর একটি সার্কাসের দল যোগদান করেছে। সেই সার্কাসের মালিক কিষ্টো বেদে বয়সে নবীন ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তার দলের বাঘও যুবা। অন্যদিকে শম্ভুর কিছুটা বয়স হয়েছে, দৈহিক গঠনে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে তার বাঘটিও স্থবির ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে শম্ভু বেদের তাঁবুতে দর্শকের টান পড়ল। তারা ভিড় করল বাজিকর কিষ্টো বেদের তাঁবুতে। তার ফলে শম্ভু ও রাধার মনে ঈর্ষার উদয় হল এবং তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। রাধা কিষ্টোর গায়ে সাপ ছুড়ে দিল, ইঁট ছুড়ে মারল, তার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিতে চাইল; শম্ভু চোলাই মদ লুকিয়ে রাখার জন্য কিষ্টোর নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ করল। কিন্তু যে রাধিকা কিষ্টোর ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল, সেই রাধিকাই পুলিশ এলে কিষ্টোর তাঁবুতে গিয়ে আশ্চর্য কৌশলে মদের বোতল সরিয়ে ফেলে এবং কিষ্টোকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়; কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়, নিদ্রামগ্ন কিষ্টোর শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসলে সবল ও সুদর্শন এই বেদে যুবকের প্রতি তরুণী বেদেনী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অতীতে শম্ভুকে দেখে রাধিকা শিবপদর প্রতি যেমন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল, বর্তমানে কিষ্টোকে দেখে শম্ভুর প্রতি তার বিতৃষ্ণার স্বরূপও একই রকমের। তাই কিষ্টোর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে তার বাধেনি। অন্যদিকে মোহময়ী রাধিকাকে গ্রহণ করতেও কিষ্টো বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব করেনি। এরপর রাধিকা কিষ্টোকে দেশান্তরে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে কিষ্টো সম্মত হয়ে যায়। কিন্তু যাওয়ার সময় রাধিকা তার এতদিনকার আশ্রয় শম্ভু বেদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ স্বৈরিণী বৃত্তি একটি চরিত্রকে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারে, তারই একটি চিত্র 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা বেদেনী চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তি তার মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর তার ফলেই তার এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে পথপরিক্রমা অব্যাহত ছিল। মনের টানে নয়, শরীরের আকর্ষণেই তার এই পরিক্রমণ। রাধিকা বেদেনীর যৌন মনস্তত্ত্ব লেখক তারাশঙ্করের কলমে সুপরিস্ফুট। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে: "তারাশঙ্করের লেখনীতে আদিম বল্গাহীন যৌন কামনার প্রতিচ্ছবি রূপেই রাধিকা চিত্রিত হয়েছে।"[৮]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব 'কল্লোল' পত্রিকার কালেই। কিন্তু 'কল্লোল'-এ তাঁর কোনো গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তবে কল্লোলীয় কঠোর বাস্তবতা, যৌন মনস্তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব এই সবকিছুই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে আরও পরিণত হয়ে দেখা দিল। তিনি ছিলেন ফ্রয়েড সচেতন। স্বনামধন্য লেখক রথীন্দ্রনাথ রায় মানিকের মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পসাহিত্য

সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা গল্পে বৈজ্ঞানিকসুলভ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিপুণতা দেখিয়েছেন।"[৯]

এ প্রসঙ্গে মানিকের 'সরীসৃপ', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'সরীসৃপ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রয়েডীয় চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বনমালী, চারু ও পরী এই তিনটি চরিত্রের প্রেম, সংশয়, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক সংকট, যৌনতা ও মানসিক বিকারকে লেখক মনস্তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। ধনী শ্বশুরের পাগল ছেলের স্ত্রী সপ্তদশী চারুকে আগলে রাখার দায়িত্বে থাকত মোসাহেরের পুত্র পনেরো বছরের বনমালী। চারু বনমালীর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলত, তাকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু ধরা দিত না। অন্যদিকে বনমালী তার সমস্ত দেহমন দিয়ে চারুকে লাভ করতে চেয়েছিল। এরপর দেখা যায়, অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বনমালী ও চারু মধ্যবয়সে উপনীত। বনমালী ধনী ব্যক্তিতে পরিণত আর চারু সর্বস্বহারা। বনমালীর কাছে সে তার শ্বশুরবাড়িও বন্ধক রেখেছে। অবশেষে একদিন বনমালী তার মাকে নিয়ে উঠে এসেছে চারুর বাড়িতে অধিকার সাব্যস্ত করতে। যে কোনো সময় বনমালী তাকে ভিটে ছাড়া করতে পারে। ফলে পুত্র ভুবনকে নিয়ে চারুর জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসে। চারু তখন বনমালীর চারপাশে মায়াজাল বিস্তার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বনমালীর কাছ থেকে সে কোনো প্রতিক্রিয়া পায় না। ইতিমধ্যে চারুর ছোটো বোন সদ্যবিধবা পরী কোলের বাচ্চা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তার জীবনেও সংকট। এবার বনমালীকে কেন্দ্র করে দুই বোনের মধ্যে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বনমালী পরীর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া চারুকে খুঁজে পায়। পরী যৌন সম্ভোগের মধ্য দিয়ে বনমালীকে জয় করে নেয়। চারু সব দেখে। সে ভাবে পরী নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে তার ছেলেকে বঞ্চিত করছে। তখন নিদারুণ প্রতিশোধস্পৃহায় চারু তারকেশ্বর থেকে কলেরার জীবাণু-দুষ্ট প্রসাদ আনে পরীকে হত্যার অভিসন্ধিতে। কিন্তু চারু নিজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এদিকে চারুর মৃত্যুর পর বনমালীর মোহ ভাঙে। এতদিন ধরে তার অবচেতন মনে পরীকে কেন্দ্র করে যে কামচেতনা বিস্তৃত হয়েছিল তা অন্তর্হিত হয়। বরং চারুর অবর্তমানে ভুবনের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে। তখন ঈর্ষাকাতর পরী ভুবনকে মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার অছিলায় ট্রেনে তুলে দেয় তার সর্বনাশ সাধনের জন্য। কিন্তু পরীর এই ষড়যন্ত্র অচিরেই ধরা পড়ে। তখন তার ঠাঁই হয় পরিচারিকাদের আবাসস্থলে। এই গল্পে ধনী থেকে গরীবে এবং মধ্যবিত্ত থেকে ধনীতে পর্যবসিত হওয়ার ফলে যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া পাত্র-পাত্রীদের মনের গতিকে মগ্নচেতনাশ্রয়ী করে তুলেছে। তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তাদের অবচেতন মনে চলতে থাকা বিভিন্ন নিগূঢ় অনুভূতি। তাই সমালোচক বলেন: "... 'সরীসৃপ' গল্পটি ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ধর্মী।"[১০]

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিবাদী শিল্পী। কিছু সংখ্যক গল্পে তিনি মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'বুধনী', 'ভিতর ও বাহির' ইত্যাদি গল্প। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনস্তত্ত্বমূলক গল্প সেভাবে লেখেননি। অবশ্য তাঁর কিছু কিছু গল্পে মনস্তত্ত্ব অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'খুঁটি-দেবতা', 'তিরোলের বালা' প্রভৃতি গল্প।

বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে একদল তরুণ বাঙালি লেখক বাংলা ছোটোগল্পের আসর জাঁকিয়ে বসলেন। মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প রচনায়ও তাঁরা বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। এই লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুবোধ ঘোষ মানব মনস্তত্ত্বের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে। তাঁর 'গরল অমিয় ভেল', 'বারবধূ, 'সুন্দরম্' প্রভৃতি মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পের সার্থক উদাহরণ। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে নারী-মনস্তত্ত্ব রূপায়িত। কালো কুৎসিতদর্শনা যুবতী মালা বিশ্বাস প্রসাধনে ও নানা আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জায় নিজেকে পুরুষের কাছে মনোহারিণী করে তুলতে চায়। কিন্তু কেউ আকৃষ্ট হয় না। একবার মালাদের মফঃস্বল শহরে কোনো এক পথের ধারের কালো পাথরে এক কুৎসাবিশারদ কবি শহরের বিভিন্ন যুবতীর নামে খড়ির আখরে কুৎসা রচনা করে। যাঁদের নামে কুৎসা, সেই যুবতীরা কিন্তু লজ্জিত হয় না। বরং পুরুষের চোখে তারা বাঞ্ছিতা হয়ে ওঠে। তা দেখে মালা বিশ্বাস নিজেই নিজের মিথ্যা কলঙ্ক গোপনে পাথরে লিখে দিয়ে আসে খড়ির আখরে। কিন্তু তার প্রতি কোনো পুরুষেরই কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। পুরুষের কাছ থেকে সমাদর পাবার তার সমস্ত গূঢ় প্রয়াস কৌশল ব্যর্থ হল। এই গল্পে বঞ্চিতা ও পুরুষসান্নিধ্য-অভিলাষী নারী-মনস্তত্ত্বের জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে। সেইসঙ্গে নারীর মনোবিকারেরও এ এক সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষ ও তাঁর গল্প 'গরল অমিয় ভেল' সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য:

> সুবোধ ঘোষ ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে তিনি এক রূপহীনা যুবতীর আত্মকুৎসা লিখনের মধ্য দিয়ে তার পুরুষবাঞ্ছিতা হবার জটিল ও তির্যক মনস্তত্ত্বকে রূপ দিয়েছেন।[১১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্পের স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'বীতংস', 'ভাঙা চশমা', 'টোপ' ইত্যাদি গল্পের। 'বীতংস' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরলালের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। সুন্দরলাল অসমের কুলি সংগ্রহের একজন দালাল। কিন্তু সে তার আসল পরিচয় গোপন রেখে সাঁওতাল পরগণায় আবির্ভূত হয় সন্ন্যাসীর বেশে। এই সুন্দরলালের কতকগুলি বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা; যার ফলে সে অশিক্ষিত, সরল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাঁওতাল মানুষের মন খুব অল্পদিনেই জয় করে নেয়। সে হাত দেখতে জানে, হাতুড়ে ডাক্তারের মতো শিকড় আদি দিয়ে কঠিন রোগ নিরাময় করে, ভূত ছাড়ায়, গঞ্জিকাসেবী সুন্দরলাল তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে শোনায়। ফলে দুই মাসের মধ্যেই সুন্দরলাল সাঁওতাল জনগণের কাছে মহাপুরুষরূপে পরিগণিত হল। এবার সে তার গূঢ় অভিসন্ধি কার্যকর করতে উঠেপড়ে লাগল। সাঁওতাল পরগণায় সুন্দরলালের আগমন হয়েছিল নিরীহ জনগণকে সুদূর অসমের চা-বাগানের কুলি হিসেবে বিক্রি করে লাভের একটা বিরাট অংশ হাসিল করার অভিপ্রায়ে। ফলে নির্বোধ সাঁওতালদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সুন্দরলাল গ্রামে মড়ক লাগবার ভয় দেখায় এবং তাদের রক্ষা করবার অছিলায় নিয়ে চলে অসমের চা-বাগানে। সেখানে সে তাদের বিক্রি করে দেয়। ইতিপূর্বে সাঁওতাল পরগণার মোড়ল ঝড়ুর একমাত্র মেয়ে বুধনীকে সুন্দরলালের ভালো লেগে যায়। তাই বুধনীকে সে কুলি করতে চায়নি। বরং বুধনীকে একান্তে পাওয়ার চিন্তা তাকে

অস্থির করে তোলে। এমনকী তাকে সে শহরে চলে আসার প্রস্তাবও দেয়। 'বীতংস' গল্পে সুন্দরলাল-চরিত্রে নানাধরনের জটিলতা উদ্ঘাটিত। অসহায় সাঁওতালদের সে তার লোভ ও কামনা পূরণের শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে নিজেকে তাদের চোখে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন করানোর জন্য। উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করতে সে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখেছে। বুধনীর মাধ্যমে তার যৌনক্ষুধা প্রকটিত হয়েছে। বিচিত্র মনস্তত্ত্বের সমন্বয়ে সুন্দরলাল-চরিত্রটি সৃষ্ট হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর ছোটোগল্পে চরিত্রের মনোগহনের জটিলতা উদ্ঘাটনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'যযাতি', 'চোর', 'চাঁদমিঞা', 'সেতার', 'রস' প্রভৃতি গল্পে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণ রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ তাঁর নানা গল্পে নরনারীর সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করেছেন। 'যযাতি' গল্পে অতৃপ্ত যৌন মনস্তত্ত্বের কথা রয়েছে। প্রবীণ অধ্যাপক ভুবনবাবু আকস্মিকভাবে রোগে পঙ্গু হয়ে যান। তাঁরই আশ্রিত তরুণ সুব্রত তাঁর সেবাযত্ন করে। সবাই আসে অসুস্থ ভুবনকে দেখতে। তাতে তাঁর মন আরও বিকল হয়ে পড়ে। একদিন অবন্তী নামে তাঁর এক অচেনা গুণমুগ্ধ ছাত্রী আসে তাঁর কাছ থেকে পড়া বুঝে নিতে। অবন্তীর প্রাণময়তা ও যৌবনচাঞ্চল্য ভুবনবাবুকে মুগ্ধ করে। তার উপস্থিতি তাঁর রোগযন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেয়। অবন্তীর সান্নিধ্যে তাঁর বয়স যেন কমে যায়। নিজের অল্পশিক্ষিতা, কালো, স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রী হিমানীর পাশাপাশি যৌবনপ্রাচুর্যে ভরপুর অবন্তীর ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। নিজেকে তাঁর বঞ্চিত মনে হয়। তাঁর এই মানসিকতা ধরা পড়েছে এই উক্তিতে: "তিনি যেন উপবাসী রয়ে গেছেন, বুভুক্ষু রয়ে গেছেন, যৌবনে যেন তিনি কোনোদিন কিছু উপভোগ করেননি।"[১২]

ভুবনবাবু পঙ্গুতায় জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কাছে রূপরসবর্ণগন্ধময় পৃথিবী যেন অধরা অনাস্বাদিতই থেকে গেছে। এক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধ হতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে হয়, অবন্তীর সঙ্গে সুব্রতর বিয়ে হলেই তিনি যেন তাদের মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন করে পাবেন। তাদের বাসনাতৃপ্তির মধ্য দিয়েই তাঁর অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ হবে। এই গল্পে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের প্রভাব আছে। পরোক্ষ যৌনভোগ এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। যৌবন চলে যাচ্ছে, অথচ তাকে আশানুরূপ ভোগ করা যায়নি, এই ক্ষোভকেই এই গল্পে রূপ দেওয়া হয়েছে।

'চোর' গল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। অমূল্যের চৌর্যপ্রবৃত্তি নববিবাহিতা রেণু কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর সর্বাঙ্গ যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। রেণুর বিমুখতায় অমূল্য বিরক্ত হয়। সে স্থির করে তার স্পর্শে আজ যে সংকুচিত, সেই রেণুকেই একদিন সে সঙ্গিনী করবে চৌর্যবৃত্তিতে। কিন্তু সত্যি যেদিন রেণু স্বামীর সঙ্গদোষে ও অভাবে পড়ে তাদের দোতলার ঘরের বিনোদবাবুর হাতঘড়ি চুরি করে নিয়ে এল, সেদিন অমূল্যের মনে হল যেন তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল। মানুষের চেতন মনের ধ্যানধারণার সঙ্গে অবচেতন মনের বৈপরীত্যের এই চিত্র মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই গল্পে ফ্রয়েডের চেতন-অবচেতন তত্ত্ব পরিবেশিত।

'চাঁদমিঞা' গল্পে মানবমনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। বৃদ্ধ বহুপত্নীক জমিদার নশরৎ আলী তাঁর প্রিয় ঘোড়ার সহিস চাঁদমিঞা এবং প্রিয়তমা পত্নী সুন্দরী রাবেয়ার মধ্যে অনুরাগের ক্ষীণ

সূচনাতেই অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহায় নশরৎ চাঁদমিঞাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে মাটির নীচের সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠুরিতে বন্ধ করে রাখেন। আর চাঁদের অশুচি স্পর্শে কলঙ্কিত রাবেয়াকে তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন চিরতরে। অথচ গল্পশেষে দেখা যায় বর্ষীয়ান নশরৎ আলীর সঙ্গে চাঁদমিঞার এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা তথা মানসিক পরিবর্তনের এই কাহিনি মানব মনস্তত্ত্বের জটিলতারই পরিচায়ক।

'সেতার' গল্পে মনোগহনের জটিলতার ছবি ফুটে উঠেছে। নীলিমা হাসপাতালে শয্যাশায়ী তার অসুস্থ স্বামী সুবিমলকে আর্থিকভাবে সহায়তা তথা সংসারের অভাব-অনটন দূর করতে গানের মাস্টারি করতে বেরিয়েছে। শুধু গান নয়, সেতারেও তার একদিন হাত ছিল। ফলে প্রয়োজনের তাগিদে সে বাইরে বেরিয়ে দুটিরই চর্চা আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে নীলিমা বেতারে ও আসরে সেতার বাজাবার জন্য আমন্ত্রিত হতে লাগল। রোগমুক্ত সুবিমল যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এল, ঘটনাক্রমে সেদিনই তার আসরে বাজাবার কথা। ঘরে স্বামীকে যখন সে সেতার বাজিয়ে শোনাতে যাবে, ঠিক সেই সময়ই তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। এই কড়া নাড়া আসলে সেই সঙ্গীতের আসরে যাওয়ার জন্য নীলিমার প্রতি আহ্বান। কিন্তু সুবিমল সেই আসরে যেতে নীলিমাকে মানা করে দিল। বহির্বিশ্বে নীলিমার যে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে উঠছিল তাতে বাদ সাধল সুবিমল। ফলে নীলিমা শূন্য নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল এবং সেতারটি হাতে তুলে নিল। এই গল্পে একদিকে যেমন নীলিমার উত্থানে সুবিমলের অহংবোধ আহত হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে খ্যাতির হাতছানি সত্ত্বেও নীলিমা কিছু করতে না পারার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রীর এই মানসিক টানাপোড়েন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'রস' গল্পে মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানুকে কেন্দ্র করে নিম্নবিত্ত মানব-মানবীর সম্পর্কের তিক্ত-মধুর টানাপোড়েন উপস্থাপিত হয়েছে। খেজুর বিক্রেতা মোতালেফ বয়সে বড়ো বিধবা মাজু খাতুনকে বিয়ে করে তার হাতযশের জন্য। এর পেছনে তার গূঢ় অভিসন্ধি ছিল সুন্দরী যুবতী ফুলবানুকে বিয়ে করার। এতদিন সে ফুলবানুকে বিয়ে করতে পারেনি টাকার অভাবে। ফলে মাজুখাতুনের বানানো সুস্বাদু গুড় চড়া দামে বাজারে বিক্রি করে মোতালেফ বেশ কিছু টাকা রোজগার করে। ইতিমধ্যে সে মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে টাকার জোরে সুন্দরী যুবতী ফুলবানুকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। কিন্তু ধীরে ধীরে মোতালেফ উপলব্ধি করে ফুলবানু রূপবতী হলেও গুণের দিক থেকে মাজুখাতুনের অবস্থান অনেকটাই উপরে। সুন্দরী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও তার তৃপ্তি নেই। তার মনে পড়ে দক্ষ পরিশ্রমী এক সময়ের জীবনসঙ্গিনী মাজুখাতুনকে। সে তার অভাব অনুভব করে। কিন্তু মাজুখাতুন ততদিনে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রেমানুভবে মোতালেফ এক হাঁড়ি রস নিয়ে মাজুখাতুনের কাছে যায়। মাজুখাতুন তাকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। গল্পের শেষে দেখা যায় নিজের দুর্দশায় ও মাজুখাতুনের অভাববোধে মোতালেফের গলা ধরে এসেছে এবং মোতালেফের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনায় মাজুখাতুনের চোখেও জল। এই গল্পের কাহিনি বিন্যাসে পাত্রপাত্রীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আরও অসংখ্য গল্প মনস্তাত্ত্বিক উপাদান-প্রাচুর্যে ভরপুর। নরেন্দ্রনাথ চরিত্রের

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কখনো নিজের বাস্তববুদ্ধি তথা বিজ্ঞানমনস্কতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। বাংলা ছোটোগল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারায় এভাবেই নানা দিক দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর যথাযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর 'যৌথ', 'মহাশ্বেতা', 'টিকেট', 'রস', 'নাম', 'যবনিকা' ইত্যাদি গল্প বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্পের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। নরেন্দ্রনাথের গল্পরচনার এই দিকটি সম্পর্কে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন:

> গরীব, নিম্নবিত্ত, মধবিত্ত (sic) সম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির মানুষকে, তাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে, পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্সংঘাতকে নরেন্দ্রনাথ গল্পে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতা নরেন্দ্রনাথের সূচীমুখ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার।"[১৩]

কুড়ি শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে আবির্ভূত আরও কয়েকজন লেখকের গল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি', নবেন্দু ঘোষের 'ত্রিশঙ্কু', আশাপূর্ণা দেবীর 'অপরাধ', সমরেশ বসুর 'শেষ মেলায়', বিমল করের 'ইঁদুর', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' প্রভৃতি গল্প।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে বাংলা ছোটোগল্পে মনোবিশ্লেষণ-রীতির যে ধারা শুরু হয়েছিল, সেই ধারা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-প্রভাবিত কল্লোল যুগ পার হয়ে সুবোধ-নরেন্দ্রনাথ-সন্তোষকুমার পর্যন্ত মধ্য বিশ শতকীয় আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে এবং হাল আমলের সাহিত্যেও অবাধে তার প্রয়োগ হয়ে চলেছে।

সূত্র


১. ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০০৩, পৃ. ১২৪।

২. তদেব, পৃ ৩৩৮।

৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পা., 'গল্পচর্চা', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৮, পৃ. ৫৭৭-৭৮।

৪. দেবকুমার বসু, 'কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য', কলকাতা: ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৩৮৭, পৃ. ১৫৯।

৫. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২।

৬. যুবনাশ্ব, 'পটলডাঙার পাঁচালী', কলকাতা: সেঞ্চুরী প্রেস, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ. ৩৩।

৭. ভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪।

৮. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ', কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ, জানুয়ারি ২০০৭,

পৃ. ১৬৯।

৯. রথীন্দ্রনাথ রায়, ‘ছোটগল্পের কথা’, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুন ১৯৮৮, পৃ. ১৪০।

১০. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪।

১১. তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ‘বাংলা ছোটগল্প: পর্ব-পর্বান্তর’, কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৪৪।

১২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ‘গল্পমালা’৭, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৮।

১৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘কালের পুত্তলিকা’, কলকাতা: দে’জ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৭৩-৭৪।

# পুরাণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ: বাণী বসুর *অষ্টম গর্ভ*

প্রাণজিৎ সরকার

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে নবজাগরণ পরবর্তীসময়ে বাংলা সাহিত্যে নানা পৌরাণিক কাহিনিকে নবরূপে দেখানোর একটি তাগিদ লক্ষ করা যায়। বাংলা কাব্য ও নাটকে এই তাগিদ শুরু হলেও কথাসাহিত্যে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এই সময় বিভিন্ন কথাসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের নানা গল্পকথাকে তাঁদের সাহিত্যের অবলম্বন করে তুলেছেন সাহিত্যিকেরা। কখনো পৌরাণিক কাহিনিকে একেবারে নবরূপে তাঁদের লেখনীতে স্থান দিয়েছেন, কখনো-বা আধুনিক কাহিনিতে পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। এই ধারার এক অন্যতম কথাসাহিত্যিক বাণী বসু রামায়ণ, মহাভারতের পুরাণ কাহিনিকে তাঁর লেখনীতে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছেন। আলোচ্য 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে বাণী বসু শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রসঙ্গকে এক নব আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী এক অস্থির সময়ের কালপর্বের প্রেক্ষাপটে শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রসঙ্গকে ইঙ্গিতধর্মীরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও নানা পুরাণ অনুষঙ্গকে নব তাৎপর্যে উপন্যাসে তুলে দেখা যায়। আলোচ্য নিবন্ধটিতে 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাস অবলম্বনে ভারতীয় ঐতিহ্যের নানান পুরাণ কাহিনির নব রূপায়নকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস থাকবে।

বীজশব্দ: অবতার, নবজাগরণ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, স্বাধীনতা ॥

**প্রাণজিৎ সরকার:** পুরাণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ: বাণী বসুর *অষ্টম গর্ভ*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৯৭-১০৮

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবানো ইতিহাসমিমং ভুবি।।"[১]

অর্থাৎ, "জগতে এই ইতিহাসকে কোন কোন কবি পূর্ব্বে আংশিকভাবে বলিয়া গিয়াছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্য কবিরা সেইভাবেই বলিবেন।"[২]

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ করলে মহাভারতের এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই উক্তি শুধু মহাভারতের ক্ষেত্রে নয়; ভারতীয় ঐতিহ্যের নানান পুরাণকাহিনির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উনিশ শতকের নবজাগরণের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে পুরাণের নানান চরিত্র, কাহিনি ইত্যাদির প্রভাব পড়ছে, কিন্তু অতীতের এই কাহিনি বা চরিত্রকে আশ্রয় করে যুগোচিত স্বাতন্ত্র্য তাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করা ও সাজিয়ে নেওয়ার তাগিদ মধ্যযুগে দেখা যায়নি। অতীতের এই কাহিনির পুনর্জন্মের জন্য উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সমালোচক বলেছেন: "By the beging of nineteenth century India was stirring with the clear signs of new life and activity and seeking to recover her soul and spirit."[৩]

নবযুগের চেতনাকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিকেরা তখন বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতির শিকড়ের কাহিনিকে। উনিশ-শতকীয় নবজাগরণের পর একশ্রেণির পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিরা দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যজগতে এক নতুন জাগরণ নিয়ে এলেন। তাঁরা মানবায়নের মূলমন্ত্রে পৌরাণিক কথাবস্তুর রূপান্তর ঘটালেন। বাংলার সাহিত্য, শিল্পজগতের এই নবজাগরণ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন: "আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, গ্রিক-লাতিনের বদলে সংস্কৃতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাও হয়েছিল অতীতে ফিরে যাবার রিভাইভালিস্ট তাগিদে নয়, জীবনে নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের জন্য।"[৪]

শ্রীঅরবিন্দ একটু অন্য সুরে বলেছেন: "Break the moulds of the past, But keep safe its gains and its sprit, on else thou hast no future."[৫]

নবজাগরণের এইসব গুণাবলি উনিশ শতকের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট। নবজাগরণের পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যিকেরা ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যকে এক নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। শ্রীঅরবিন্দ মানবজীবনে পুরাতন সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নের গুরুত্বকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন:

> We have to recover the Aryan Sprit and ideal and keep it intact but enshrined in new forms and more expansive insstitutions. We have to treasure jealously everything which is of permanent value, essential to our spirit or helpful to the future, but we must not cabin the expending spirit of Indian temporary forms which are the creation of the last few hundred years.[৬]

তাই বাংলা সাহিত্য, শিল্পকলাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের ঐতিহ্যশালী পুরাতন সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন চলতে থাকে। স্বভাবতই নবজাগরণের পর ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতিনিধি পুরাণাশ্রিত সাহিত্যে নানা রূপান্তর দেখা দেয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে পুরাণের কাহিনি, চরিত্র একপ্রকার মৃতবৎ অবস্থায় ছিল। কিন্তু

নবজাগরণ-পরবর্তী যুগে সাহিত্যিকদের কলমে পৌরাণিক কাহিনি এক নতুন রূপ লাভ করে। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রে দ্রৌপদী যখন কামাতুর অর্জুনকে বলেন:

দেব-ভোগভোগী তুমি,
দেব সভামাঝে আসীন দেবোদ্রাসনে।
সতত আদরে সেবে
তোমা সুরবালা।[৭]

তখন আমাদের সামনে দ্রৌপদীর আধুনিক মানসিকতা ও চারিত্রিক শক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে অথবা রবীন্দ্রনাথের

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর কুন্তী যখন কর্ণকে বলেন:

ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে করে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন-তবু হায়,
তোর লাগি বিশ্ব মাঝে
বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।[৮]

তখন মাতৃহৃদয়ের এই আন্তরিক উদ্বিগ্নতা পার্থিব সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। এইভাবে মহাভারতের প্রাক্তন কাহিনির নবরূপায়ণ আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের জগতেও বিবিধ পরিমাণে লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে প্রথমদিকে নাটক, কাব্য-নাটক এসবে পুরাণকাহিনির চর্চা শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই পুরাণকাহিনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আধুনিক মন সাহিত্যে সর্বদা আধুনিক রস সন্ধান করে। এই সন্ধানের জন্যই প্রত্যেক যুগ নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে। নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ স্রষ্টা যেমন পান তেমনই পাঠকও সৃষ্টি থেকে আধুনিক রস অনুসন্ধান করেন। পুরাণকাহিনির মধ্যে এমন কিছু সার্বজনীনতা আছে, যা প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক কালে সংবেদনশীল মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তবে আমরা সকলেই জানি পুরাণকাহিনির মধ্যে নানা অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক মন যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননির্ভর। ফলে এদিক থেকে পুরাণের অলৌকিকতার সঙ্গে আধুনিকমনের এক বিপ্রতীপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা সত্বেও বলা যায় পুরাণ কাহিনির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের মানসলোকের কতগুলি ধ্রুব ও বাস্তব প্রতীতি। তাই চলমান সময়ের বিবর্তনে পুরাণকাহিনির বাইরের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও আদতে সেটি থেকে যায় মানুষের চিরকালের ঋক্‌থ হিসেবে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলা যায়: "একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বহু ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।"[৯]

আধুনিককালে মানুষের অবচেতনের গভীরে অনিবার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে পুরাণের অভিঘাত সঞ্চিত হয়ে আছে। পৌরাণিক ঘটনাগুলি কেবল একবার ঘটছে না, বারবার নতুন ব্যাপ্তি নিয়ে এসে তা সকলকে স্পর্শ করে।

ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনিগুলি।

এ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনির আদর্শ, দর্শনভাবনা মানুষের জীবনে শক্তিরূপে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে এই পুরাণকাহিনির ব্যবহার হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। এই নানা পৌরাণিক কাহিনির থেকে রস সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকারেরা তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গনে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার করেছেন তবে যুগসাপেক্ষে এই পৌরাণিক কাহিনি ব্যবহারের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক যুগের সাহিত্যকারেরা পৌরাণিক কাহিনিকে কখনো একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন আবার কখনো পৌরাণিক প্রেক্ষাপট বজায় রেখেই সেখানে আধুনিক চিন্তাভাবনা সঞ্চারের প্রচেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে এই পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার অনেক আগে থেকে শুরু হলেও কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটেছে অনেক পরে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। এই সময় কথাসাহিত্যিকেরা আধুনিক যুক্তিবোধ দিয়ে পুরাণকাহিনিকে নতুনভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বারীন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ বিশী, সমরেশ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দীপকচন্দ্র, বাণী বসুর কথাসাহিত্যের অঙ্গনে পৌরাণিক নানা কাহিনি চরিত্র পাঠকের সামনে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার মোড়কে উপস্থাপিত হয়।

পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীনকাল সম্বন্ধীয় বিবিধ শাস্ত্রকথা। পুরাণ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে নানান ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বায়ুপুরাণ অনুযায়ী 'পুরাণ' শব্দের অর্থ: "প্রাচীনকালে যা জীবিত ছিল।"[১০] ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পুরাণকাহিনির সঙ্গে কিছু ধর্মীয় ব্যাপার যুক্ত হয়ে আছে। পুরাণ সম্পর্কে অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, উপনিষদে এবং মহাভারতের নানাব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর সেইসব থেকে জানা যায় যে আঠাশটি মহাপুরাণ এবং অজস্র উপপুরাণ রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য দুটিকে পুরাণের আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু বলছেন: "মহাভারতে ভারতপুরাণ সঞ্চিত আছে।"[১১]

আর এই নানা পুরাণকাহিনি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের নানান প্রসঙ্গ আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতে বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। পুরাণ কাহিনির ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সাহিত্যিকেরা নিজস্ব কল্পনায় একে নবরূপ দান করেছেন। সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "মিথের অন্তর্নিহিত কালচারাল idiom (ঐতিহ্য) এবং স্রষ্টার inner world-এর মেলবন্ধনে সম্পূর্ণ হয় মিথচর্চা আর তার চূড়ান্ত সার্থকতা এখানেই নিহিত।"[১২]

বাংলা কথাসাহিত্যে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার ঘটেছে অনেক পরে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি, রচনাশৈলী, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন এইসমস্ত কিছু গুরুত্ব পায়। ফলত ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্যই থাকে পৌরাণিককাহিনিকে আধুনিক জীবনসম্মত করে ফুটিয়ে তোলা। আর এই কাজটি করতে গিয়ে পুরাণকে তাঁরা ইতিহাসের পটে প্রস্ফুটিত করেন। ঔপন্যাসিকের হাতে পৌরাণিক নানা চরিত্র আধুনিক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও ঔপন্যাসিকেরা পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেন এবং সেগুলোকে যুগোপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পৌরাণিক নানা কাহিনির অন্তরালে যে চিরন্তন সত্য রয়েছে সেই সত্যকে তাঁরা আধুনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেন। সমালোচক এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন: "পুরাণ বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পস্রষ্টা উপন্যাসে চিরন্তন মানবহৃদয়কে আবিষ্কার করেন। পুরাণ রসও মানবরসের যথার্থ সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে পৌরাণিক উপন্যাসের সার্থকতা।"[১৩]

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔ পন্যাসিকেরা যখন পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিকে আধুনিক জীবন

দৃষ্টিকোণে দেখার চেষ্টা করেন, তখন সেই পুরাণের সেই চরিত্রগুলো আধুনিক মানুষের সমপর্যায়ে এসে স্থির হয়। আধুনিক মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, সংকট, বিপর্যয় মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এই সমস্ত কিছু পৌরাণিক নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

ঔপন্যাসিক বারীন্দ্রনাথ দাসের হাত ধরে প্রথম পৌরাণিক উপন্যাসের পথ চলা শুরু। বারীন্দ্রনাথ দাস পুরাণ কাহিনির একটি অন্যতম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে লেখেন‘ শ্রীকৃষ্ণবাসুদেব’উপন্যাসটি। উপন্যাসটিতে বারীন্দ্রনাথ দাস শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপের অন্তরালে তার মানব মনের নানান সমস্যা, যন্ত্রণা, সংঘর্ষ সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়াও পৌরাণিক কাহিনির নানা ষড়যন্ত্র দ্বন্দ্ব, জটিলতা, রাজনীতি এইসবকে তিনি আধুনিক রাজনৈতিক চক্রান্তের সমদর্শী করে দেখানোর প্রচেষ্টা করেছেন। বারীন্দ্রনাথ দাসের এই উপন্যাসটির কাহিনি পৌরাণিক হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের আধুনিক মননকে স্পর্শ করে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে প্রমথনাথ বিশীর ‘পূর্ণাবতার’ চিত্ত সিংহের ‘জতুগৃহ’, সমরেশ বসুর ‘শাম্ব’, ‘পৃথা’, ‘অন্তিম প্রণয়’, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘পাঞ্চজন্য’ ইত্যাদি উপন্যাসে পৌরাণিক নানান কাহিনি, চরিত্রকে আধুনিক জীবনসম্মতকরে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে। তবে এর পরবর্তীতে ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্রের হাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকেন্দ্রিক প্রভৃত লেখার সন্ধান পাওয়া যায়। পৌরাণিক নানান চরিত্রকে উপন্যাসে আধুনিক জীবন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর প্রয়াস করেছেন। দীপকচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রথম পৌরাণিক ত্রিলজির নিদর্শন পাওয়া গেল। পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ’, ‘ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ’,‘বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ’। এ ছাড়াও এই কৃষ্ণচরিত্রকে নিয়ে দীপকচন্দ্র আরও কিছু উপন্যাস লিখেছেন যেমন ‘শ্রীকৃষ্ণসুন্দরম’, ‘কৃষ্ণঅর্জুনসংবাদ’, ‘কৃষ্ণস্তভগবান’ ইত্যাদি। দীপকচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণকে আধুনিকজীবন ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখালেখিতে শ্রীকৃষ্ণের নানান অলৌকিক কাহিনিগুলোকে আধুনিক যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করা হয়েছে। এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ শুধু ভগবানরূপে থাকেননি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন আধুনিক মানবচরিত্র। আধুনিক মানবজীবনের দ্বন্দ্ব, জটিলতা, সংশয়, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, বিষাদ এ সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক মানুষ। শৈশবের শুরু থেকে নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে তাঁকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এরপর ভারতের রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মহাভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই স্বপ্নপূরণ হলেও শেষপর্যন্ত দুঃখ-বেদনায় হতাশায় শ্রীকৃষ্ণের মন ভেঙে যায়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই ট্র্যাজিক পরিণতিকে দীপকচন্দ্র খুব সুচারুরূপে আধুনিক জীবন দৃষ্টিকোণে দেখিয়েছেন। যুগপরিস্থিতির নানান জটিলতায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের এই অবতাররূপের পেছনে যে এক লৌকিক সংগ্রামী মানুষ রয়েছেন তাঁকে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা। দীপকচন্দ্র এক্ষেত্রে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়াও পরবর্তীতে ঔপন্যাসিক বাণী বসু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলগ্নের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে লিখেছেন এক মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘অষ্টম গর্ভ’। তারও পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ জীবনকাহিনিকে নিয়ে বাণী বসু লিখেছেন ‘কৃষ্ণবাসুদেব’ উপন্যাসটি। আমাদের আলোচ্য ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসটিতে বাণী বসু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লগ্নের সঙ্গে চল্লিশের দশকের ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ‘অষ্টমগর্ভ’ উপন্যাসের চরিত্রগুলো আধুনিক জীবন থেকে তুলে আনা হলেও এর ভিতর রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলগ্নের পৌরাণিক ভাবধারা।

হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা ঔপন্যাসিক বাণী বসু কলকাতার

উত্তরপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে লালিত হয়েছেন। ছোটোবেলা থেকেই দিদি গৌরী ধর্মপালের সান্নিধ্যে দেশ-বিদেশের নানা জ্ঞান আহরণে তিনি সমৃদ্ধ হতেন। তিনি জীবনের পরিণত পর্যায়ে এসে লেখালেখি শুরু করলেও বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি এক মৌলিকতার ছাপ রেখেছেন। বিবিধ বিষয় নিয়ে লেখালেখির পাশাপাশি তিনি বিগত দশক থেকে পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর ছোটোগল্প, উপন্যাস রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন। তবে তিনি পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে একটু ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানোর প্রয়াস করেছেন। তিনি পুরাণ কাহিনিতে আধুনিক রস যেমন সঞ্চার করেছেন, তেমনই পুরাণ কাহিনির নানা অলিখিত-অকথিত তথ্যকে যুক্তিসম্মতভাবে তাঁর লেখায় স্থান নিয়েছেন। তিনি পুরাণ কাহিনির সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: "পুরাণ মানেই কিন্তু রিলিজন বা আধ্যাত্মিকতা নয়। তবে এটা ঠিক ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্যে ভারতীয় দর্শনের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে।"[১৪]

এই পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে তিনি আধুনিক যুক্তিবোধে বিচার করে সময়োপযোগী করে তোলার প্রয়াস করেছেন। আর এর পেছনে মূল কারণ ছিল বাণী বসুর যুক্তিবোধের প্রাবল্য। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন:

> আমার একটা ঝোঁক হচ্ছে রেশনালিটি, সবকিছু রিজন দিয়ে বুঝে নিতে চাই। আমাদের মহাকাব্য পড়ে ইউরোপীয়রা বলতেন এরা লিখতে জানে না। তাই কতগুলো উদ্ভট রূপকথা লিখে গেছে। ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি। আমাদের পুরাণ কিন্তু আসলে আমাদের ইতিহাস। এভাবেই ইতিহাস রেকর্ড করেছি আমরা কেন কী বৃত্তান্ত সে অনেক কথা তার ভেতরে নাই গেলাম আর মহাকাব্য বা পুরাণেও যে অতিকথন রয়েছে তা হলো আমাদের স্টাইল।[১৫]

বাণী বসু মহাকাব্য, পুরাণের এই অতিরঞ্জনের অন্তরালের প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে। কখনো সরাসরিভাবে তিনি পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন আবার কখনো মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনিকে ইঙ্গিতধর্মীভাবে আধুনিকযুগ প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। বাণী বসু 'তুলসীপুরাণ', 'মহাপ্রস্থানেরপথে', 'লক্ষণ' ইত্যাদি অনেক পুরাণ কাহিনিনির্ভর ছোটগল্প রচনা করেছেন। তার পাশাপাশি মহাকাব্য পুরাণের কাহিনিকে অবলম্বন করে 'মিথরাস','রাধানগর', 'অষ্টমগর্ভ', 'পাঞ্চালকন্যাকৃষ্ণা', 'কৃষ্ণ', 'ক্ষত্রবধূ', 'কালিন্দী', 'কৃষ্ণবাসুদেব' ইত্যাদি কালজয়ী উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসগুলো কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনই উপন্যাস রচনা কৌশলেও এক অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম উপন্যাস 'অষ্টম গর্ভ'। উপন্যাসটিতে তিনটি শিশুর চোখে ভারতবর্ষের এক উত্তাল পরিস্থিতি থেকে পরিস্থিতিকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই উপন্যাসটি বাণী বসুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "আমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস অষ্টম গর্ভে বুবু বা বিদ্যা বলে যে মেয়েটি সে খুব কাছাকাছি আমার।"[১৬]

এই কালজয়ী উপন্যাসে শিশুদের চোখে তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তাল পরিস্থিতিকে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনই এই উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসে পুরাণকাহিনির এক সাজুয্য তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাণী বসু বলেছেন:

> আমার মনে হয়েছিল শিশুরা যেভাবে জগত ও অভিজ্ঞতাকে দেখে তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। বাচ্চাদের ভিসন বলে সেটাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। বহুমাত্রিক

> জীবনের একটা মাত্রা তারাই উন্মোচন করে। শিশুর ইন্টারপ্রেটেশন অফ লাইফ তার বিশেষ মূল্য আছে পরে সেটা পাল্টে যায়। যেমন অনেকবারই আমাদের জীবন দেখা পাল্টে যেতে পারে। এ ছাড়াও কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে কিছু সিম্বলিজম আছে। সব শিশুই বাচ্চাবেলায় কতগুলো সংকট পার হয়। সেই সংকটগুলোই অসুর, অসুরনি ইত্যাদি। সব শিশুই পোটেনসিয়াল কৃষ্ণ।"[১৭]

বাণী বসু 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে আধুনিক জীবন কাহিনির অন্তরালে কৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। পুরাণে যেভাবে ধর্মসংস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল উপন্যাসে তেমন ভারতবর্ষের উত্তাল পরিস্থিতিকে সুস্থির করবার জন্য একজন অবতারের প্রয়োজন। এই অবতারবোধের নানান দার্শনিক উপলব্ধি আমরা 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসের কাহিনিবৃন্তে দেখতে পাব।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটি। বাণী বসুর এই উপন্যাসটির শিরোনাম আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ এই উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে কৃষ্ণকথার ইঙ্গিত। পুরাণে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃত। কংসের অত্যাচারে জনগণ ভয়াবহ বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে পড়েছিল এ ছাড়াও অত্যাচারী রাজা কংস তার পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসনে বসে। সেইসময় এই উৎপীড়ন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য দেবতারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তাঁরা স্থির করেন যে কংসের ভগ্নি দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানরূপে স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হবেন। এই অধর্মে লাঞ্ছিত পৃথিবীকে ধর্মের পথে নিয়ে আসতে এবং নতুন সমাজ তৈরি করতে স্বয়ং নারায়ণ কংসের বিনাশ ঘটাবেন। শুনতে পেয়ে কংস তার ভগ্নি দেবকিকে কারাগারে বন্দী করেন এবং একে একে সন্তান জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণকে জন্মের পরই নন্দ রাজার ঘরে রেখে আসা হয় এবং তিনি সঙ্গে নিয়ে আসে নন্দগোপের সদ্যোজাত কন্যাকে। সেই কন্যাকে পরদিন সকালে কংসবধ করবার সময় সেই কন্যা মহামায়া রূপ ধারণ করে অদৃশ্য হয়ে যান। যাবার পূর্বে তিনি পুনরায় সেই কংসবধের ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেন এবং পরবর্তীতে দেখা যায় কৃষ্ণের দ্বারা কংসবধ সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা বিষয়ক নানা কাহিনি ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। কৃষ্ণ মহাভারতেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সমাজপরিস্থিতিকে ধর্মের পথে নিয়ে আসার জন্য তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গ নিয়েছেন এবং অধর্মকে বিনাশ করে ভারতবর্ষে এক নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। পতঞ্জলির মতে কৃষ্ণ বসুদেব ক্ষত্রিয় বিশেষণ তিনি একজন দেবতা। কৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ রয়েছে— তিনি একদিকে যেমন যুদ্ধে পারদর্শী, কূটনীতিবিদ এবং পরমজ্ঞানী; অন্যদিকে তেমনই সখা-প্রেমিকরূপেও পরিচিত। বৈষ্ণব মতে এই কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। পরমাত্মা রাধা তাঁর হ্লহ্লাদিনীশক্তি। বিপদে দেবতারা তাঁকে স্মরণ করেন এবং যখনই দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তখনই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে বাণী বসু একুশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই পৌরাণিক কাহিনির ব্যঞ্জনাকে উপন্যাসে কেন তুলে আনলেন। 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসের ভূমিকায় বাণী বসু জানিয়েছেন:

> কৃষ্ণ এক অদ্ভুতকর্মাশিশুর নাম। আমাদের লোককথায় পুরাণে আমাদের চেতনায় মিশে আছে কৃষ্ণকথা। তারও পরে আছে অবতার ভাবনা। প্রতিনিয়ত আমরা কৃষ্ণের

> অবতরণের আশায় থাকি। এই প্রত্যাশা যেমন করুণ তেমনি কৌতুকাবহ। কেননা জাতীয় চৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে এ কৃষ্ণকথা যেন একরূপক। যা বাস্তব হয়ে উঠতে চায় ঘরে ঘরে, শিশুদের জন্মে, তাদের বড় হয়ে ওঠায়,তাদের সম্পর্কে। আমাদের আশায় কোনো না কোনোভাবে তারাও অদ্ভুতকর্মা। যেন এক একটি ছায়া বৃক্ষ মহামানবের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন শুধু আমাদের বিশেষত্ব নয় স্বপ্ন। ছোট এই আকাঙক্ষার একান্ত মানবিক প্রেক্ষাপটে তিনটি শিশুর বেড়ে ওঠার কাহিনি অষ্টম গর্ভ।[১৮]

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের চেতনায় এবং বৃহত্তর অর্থে জাতীয়চেতনায় জড়িয়ে আছেন। কৃষ্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যের এক আদর্শ পুরুষ যিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে গিয়ে সমাজে ন্যায়-নীতিধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজের বিশৃংখল অস্থির পরিস্থিতিকে স্থির করবার জন্য কখনো তিনি কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছেন বা কখনো সুদক্ষ রাজনীতিবিদের মতো তাঁর কর্ম সম্পাদন করেছেন এর ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তাকেও নানান যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাণী বসুর 'অষ্টম গর্ভে' ভারতবর্ষের এক অস্থির কালপর্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সমালোচক বলছেন: ''বঙ্গভূমি তথা ভারত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এক বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে স্থাপিত এই উপন্যাসে অষ্টম গর্ভ নামকরণ একটি ইঙ্গিত বলা যেতে পারে একটি প্রত্যাশাও।''[১৯]

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসের কাহিনির অন্তরালে কৃষ্ণের অবতারের প্রত্যাশা যেমন ব্যঞ্জিত হয়েছে, তেমনই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ সৃষ্টিতেও পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। শুধু কৃষ্ণের এই পৌরাণিক কাহিনি নয়, উপন্যাসের অন্যত্র ছড়িয়ে রয়েছে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ। সমস্ত ঘটনাই উপন্যাসে যথার্থ ইঙ্গিত বহন করেছে।

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসের শুরুতেই পূর্বরঙ্গে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীতে যখনই ধর্মের বিনাশ ঘটে সেই সময় অধর্মকে রক্ষা করার জন্য অবতার পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং এই অবতার পুরুষ কৃষ্ণ আর সুদর্শনচক্র দ্বারা সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটান। শ্রীকৃষ্ণ বলেন: ''কুরুবংশ ধ্বংস করিয়াছি, যদুবংশ ধ্বংস করিয়াছি। যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ইত্যাদি ইত্যাদি।''[২০]

কিন্তু বর্তমান সমাজের অস্থির পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে লেখিকা এই উক্তি মানতে পারেননি তিনি উপলব্ধি করেছেন সমাজের সর্বত্রই এক শ্রেণির মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষের ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত সমাজে পদদলিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পালটা প্রশ্ন করেছেন: ''ধ্বংস করিতে কি সত্যই পারিয়াছেন? এত দুঃশাসন কোথা হইতে আসিল? এত শকুনি!''[২১]

এই প্রশ্ন এখানে শুধু লেখিকার নয় সমাজের প্রত্যেক সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছেন এবং প্রচ্ছন্ন মনে এক অবতার পুরুষের কল্পনা করেছেন সমাজ পরিস্থিতিকে রক্ষা করবার জন্য। সেই সুরই আমরা 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসের দুর্গাপ্রসাদ ও তার পরিবারের মনে লক্ষ করে থাকি।

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে মন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি জটিল সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রেক্ষাপটে রেখে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই বিপর্যয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষ সুদিনের অপেক্ষায় ছিলেন। কৃষ্ণকথার অংশরূপী অবক্ষয় সময়ের বেড়াজালে তারা প্রত্যাশা করেছেন এক মহামানব এক বা এক শুভবুদ্ধি তাদের রক্ষা করতে পারে। এই ভাবনা-চিন্তনের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ লক্ষ করা যায় উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের আবির্ভাব অংশে। উপন্যাসের দুর্গাপ্রসাদ ও তার বাবা এই সংকটময় মুহূর্তে বিশ্বাস করেন ঘরের একমাত্র বউ দেবহুতির গর্ভে কৃষ্ণ

আবির্ভূত হবেন। সেই কারণে দেবহুতি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন দুর্গাপ্রসাদ প্রতিনিয়ত গীতা পাঠ করেন। প্রসব হবার কিছু মুহূর্ত আগে তাই বাড়ির লোকের উপলব্ধি:

> এক কানে প্রসূতির চিৎকার আরেক কানে ভাগবতের। বাবাও দেখছিলেন পৃথিবী আর্তনাদ করছে সেই আর্তনাদ তার কানে গেছে। চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধুয়ে যাচ্ছে তার দিকে আসন টলছে, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তিনি আসছেন নেমে আসছেন। কারাগারের লোহার দরজা খুলে গেল। আমি সরাক ধরে অবতীর্ণ হলাম কারিয়াপিরেত বারোমাস, কুৎসিত লোলচর্ম এক বাদর বাচ্চা।[২২]

চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষ চেয়েছিল কৃষ্ণের মতো এক শক্তিধর নেতাকে। পুরাণে রয়েছে দেবকির অষ্টম পর্বের একটি মাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু উপন্যাসে দেবহুতির আশ্রম তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে এই ব্যাপারে দেবহুতির পরিবার অনুরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না-হয়ে এরমধ্যেই এক ইতিবাচক দিক খুঁজে নেয়। উপন্যাসের একটি চরিত্র কালিকামহান বলে "প্রথমটি ঠিকঠাক অষ্টমগর্ভ শিবু।"[২৩]

ঘরে তিনটি সন্তান জন্ম হওয়ায় সংসারের নানা টানাপোড়েন এবং পরিস্থিতির চাপে বুলবুলকে তার দিদিমা তরুবালার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে কৃষ্ণের জন্মের পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের বর্তমান কাহিনি মিলে যায়। পৌরাণিক কাহিনিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণের জন্মের সময় কৃষ্ণকে তার পিতা এক ঝড়ের রাত্রে গোকুলে যশোদার কাছে রেখে আসেন এবং পরিবর্তে নন্দ যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে আসেন। উপন্যাসে বুনবুনকেও আমরা দেখি জন্মের কিছু সময় পরই তাকে তার দিদিমা তরুবালার কাছে মানুষ হতে হয় সেই সময় বুনবুনের উপলব্ধি: "আমি এখন মাতৃক্রোড়ে মা নয় তবু মাই, দেবকি নন্দন কানাইয়া এখন যশোদা দুলাল।"[২৪]

কাহিনিতে রয়েছে, কংস যখন জানতে পারেন কৃষ্ণের জীবিত অবস্থার কথা সেইসময় বিভিন্ন রাক্ষস-রাক্ষসী তিনি গোকুলে প্রেরণ করে কৃষ্ণকে মারার চেষ্টা করেন এবং কৃষ্ণ এই সমস্ত বাধা-বিপদকে প্রতিহত করে সংগ্রাম করে গেছেন। এই পৌরাণিক আবহের সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের কিছু মিল লক্ষ করা যায়, উপন্যাসে রয়েছে বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন জায়গার নানান গন্ধে ছোটো সন্তানেরা বিরক্তবোধ করছে এবং সেগুলো থেকে তারা প্রতিনিয়ত পালানোর চেষ্টা করছে এই প্রসঙ্গ উপন্যাসে রয়েছে: "ধোয়া পুতোনার থেকে পালাচ্ছে। কোন কোনদিন ভীষণ মেছো মেছো গন্ধ থাকে হাতে হয়তো কুচো মাছ বেঁচেছেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি হাতটা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আড়সোলার থেকে পালাচ্ছি তেল পুতনার থেকে পালাচ্ছে।"[২৫] এটা শৈশবেই পুতনা, শিশুদের কাছে অপছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ভেতর এই অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে।

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে মূলত এই কৃষ্ণকথার নানান অনুষঙ্গ এসেছে বারবার। তবে এই সমস্ত বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে কাজ করেছে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এক প্রত্যাশা। ভারতবর্ষের এক জটিল সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি মানুষ স্বপ্ন দেখেছে কৃষ্ণ-অবতারের। এই অবতার বোধের ধারণায় পরিস্ফুট হয়েছে এই উপন্যাসটির কাহিনি নির্মাণে। উপন্যাসটির কাহিনিতে অনেকসময় সুভাষচন্দ্র বসুর বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। লেখকের চোখে এই সুভাষচন্দ্রই হয়ে উঠেছেন কৃষ্ণের অবতারস্বরূপ। উপন্যাসে বর্ণিত সারদাবাবুর কণ্ঠে আমরা লেখকেরই অভিব্যক্তির প্রকাশ পাই:

আমাগো প্রয়োজন নাই একটি কৃষ্ণ অবতারের। সারদাবাবু বললেন সেই তিনি ইন্দ্র ভজনা বন্ধ করিলেন। বাস ইন্দোর কুপিত হইয়া বৃষ্টি পাঠাইলেন বৃষ্টিতে ব্রজ ভাইসা যায় তখন তিনি গিরিগোবর্ধন এক আঙ্গুলে তুইলা ছাতার মতন ধরলেন ব্রজবাসের মাথার উপর... কে ছাতা ধরবে... ছিলেন একজনতা তাকে তো গুম করে রেখেছে। সুভাষবাবুর কথা কইছেন তো তিনি থাকলে তো এই সংকট হইতই না। দেশভাগ তিনি কখনো মাইনতেন না, ইন্টেনশনের কথা যদি বলতি হয়তো তিনিও কৃষ্ণের মত স্বার্থ দেখেন নাই, ব্যক্তিগত লাভের জন্য লালায়িত হন নাই।[২৬]

এখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠেছেন আধুনিক কৃষ্ণের এক বিবর্তিত রূপ।

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটিতে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছাড়াও উপন্যাসটিতে আরও নানান পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে দুর্গাপ্রসাদ এর ছেলে পাবনের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনাতেও কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এক ইঙ্গিত পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। উপন্যাসে দেখা যায়, ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে দুর্গাপ্রসাদের ছেলে পাবন হারিয়ে যাওয়ার পর এক স্বেচ্ছাসেবী দলের হাত ধরে আবার পুনরায় ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে: "কংস সেবার পাঠায় ত্রিনাবর্তসুরকে। ক্রীড়ানত যশোদা দুলালকে সে বাতাসের ঘূর্নির রূপ ধরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সারা ব্রজ তখন শিশুর জন্য হায় হায় করছে। এক বিকট অসুরের মৃতদেহের বুকের ওপর শিশুটি তার গলা জড়িয়ে হাসছে।"[২৭]

এ ছাড়াও উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে পৌরাণিক কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। উপন্যাসের পিসিমা চরিত্রটিকে বলা হয়েছে মিনিয়েচার লক্ষ্মী, পমদিদি চরিত্রটিকে বলা হয়েছে সরস্বতী কিংবা দুর্গা। তৎকালীন ভারতবর্ষের নানান অশুভ শক্তি এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী মানুষগুলোকে উপন্যাসের শিশুমন রাক্ষসের সঙ্গে তুলনা করেছে। নিষ্পাপ শিশুমন ভেবেছিল ভারতবর্ষের এব সমস্ত কিছু থাকবে সমস্ত ইচ্ছাপূরণ মানুষ করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে এখানে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে: "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরওর নায়ক ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর এদের সংঘ এবং যাচাইছিলেন সেই রাজত্ব অতলশ্বর্য ভাইদের আনুগত্য সহযোগিতা প্রজাদের সন্তোষ একসঙ্গে পাননি।"[২৮] অর্থাৎ মানবজীবনের এক অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে বাণী বসু অবশ্যই উপন্যাসে কৃষ্ণের অবতারবোধের প্রসঙ্গ যেমন এনেছেন, তার পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু পাঠককুলকে তিনি বুঝিয়েছেন যে অবতার কোন নির্দিষ্ট একজনের হাত ধরে পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয়।

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ সম্মিলিতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তবেই অধর্মকে বিনাশ করা সম্ভব। মানুষের ভেতরের চেতনশক্তিকে জাগ্রত করতে পারলে তবে কৃষ্ণের চরিত্র সত্যি পাওয়া সম্ভব; উপন্যাসের তিনটি শিশুচরিত্র এই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ঔপন্যাসিক বলেছেন: "আর প্রার্থনার কোন প্রশ্নই নেই কারণ সে সম্মিলিতভাবে তারা নিজেরাই তো এক একটা অবতার পুরুষ যার জন্য সারদাবাবুদের দুর্গাপ্রসাদবাবুদের মতো আরো কত কোটি কোটি মানুষ দুর্গত মানুষ অন্যায়-অবিচারে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের প্রার্থনা।"[২৯]

উপন্যাসে তিনটি শিশুর আত্মচৈতন্যের জাগরণের মধ্য দিয়ে বা শিশু কৃষ্ণের অবতার অবতারবোধের

ধারণাকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সূত্র

১. শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, 'মহাভারতম্', আদিপর্ব, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনু.), কলকাতা: বিশ্ববাণী, ১৪২২ ব., পৃ.২৩।

২. তদেব, পৃ. ২৩।

৩. G. N. Sarma, 'Sri Aurobindo and the Indian Renaissance', Bangalore: Ultra, 1977, p. 7.

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ইতালীর রেনেসাঁস: বাঙালীর সংস্কৃতি', কলকাতা: আনন্দ, ২০০৯, পৃ. ১৯।

৫. Sri Aurobindo, "Thought and Aphorisms", in G.N. Sarma, op.cit, p. 17.

৬. Sri Aurobindo, "The Karmayogin", in G.N. Sarma, ibid, p. 174.

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'মধুসূদন রচনাবলী', কলকাতা: সাহিত্যম, ২০০৫, পৃ. ১৪০।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০ ব., পৃ. ১৪৯।

৯. বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা: এম সি সরকার, ১৯৭৪, পৃ. ৩২।

১০. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), 'বায়ুপুরাণ', কলকাতা: বঙ্গবাসী, ১৩১৭ ব., পৃ. ১৭।

১১. বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

১২. চন্দ্রমল্লি সেনগুপ্ত, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১, পৃ. ২৯।

১৩. সচ্চিদানন্দ দাস, 'বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪২১ ব., পৃ. ২৬৬।

১৪. শান্তনু ভট্টাচার্য ও অরিন্দম বারিক, "কলস্বনা: বাণী বসু", উজ্জ্বল গোস্বামী (সম্পা.), 'লেখা দিয়ে রেখাপাত', নৈহাটি. পূর্ণপ্রতিমা, ২০২২, পৃ. ২৭।

১৫. তদেব, পৃ. ২২।

১৬. অনিন্দ্য সৌরভ, "বাণী বসুর মুখোমুখি", অনিন্দ্য সৌরভ (সম্পা.), 'শিল্পসাহিত্য', মেদিনীপুর, ২০২৩, পৃ. ৯৩।

১৭. শান্তনু ভট্টাচার্য ও অরিন্দম বারিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

১৮. বাণী বসু, 'অষ্টম গর্ভ', কলকাতা: আনন্দ, ২০১৮, পৃ. ভূমিকা।

১৯. সুমিতা চক্রবর্তী, "অষ্টম গর্ভ: শৈলী ও প্রতিপাদ্যের সাহসী সমন্বয়", উজ্জ্বল গোস্বামী (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

২০. বাণী বসু, 'অষ্টম গর্ভ', পৃ. ৪।

২১. তদেব, পৃ. ৯।

২২. তদেব,পৃ. ৮।

২৩. তদেব,পৃ. ৯।

২৪. তদেব,পৃ. ২৫।

২৫. তদেব, পৃ. ৩৪।

২৬. তদেব, পৃ. ৩১৩।

২৭. তদেব, পৃ. ১৭৭।

২৮. তদেব, পৃ. ১৬২।

২৯. তদেব, পৃ. ৩১৬।

# কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ: বর্ণময় সাংবাদিকের জীবনালেখ্য

অশোককুমার রায়

সারসংক্ষেপ

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসের বিষয় হিসেবে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের জগৎ বারবার উঠে এসেছে। তাঁর সাহিত্যজীবনে পেশাগত জীবনের প্রভাব যথেষ্ট। আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের উপযোগিতার নিরেখে তাঁর চিন্তাধারা প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। কুড়ি শতকে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতার গুরুত্ব তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলিও উপলব্ধি করতে পেরেছে। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম আলোকিত ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ যেন নিজের জীবনকেই তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। তাঁর বাঁচার লড়াই, জীবনযন্ত্রণা, সমাজভাবনা, একনিষ্ঠতা— সবকিছু ধরা পড়েছে সাহিত্য ও সাংবাদিকতায়। সীমিত ও নির্দিষ্ট পরিসরে তাঁর সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে মূল্যায়ন করাই এ রচনার উদ্দিষ্ট।

বীজশব্দ: আনন্দবাজার পত্রিকা, উপন্যাস, কর্মসাধনা, সংবাদ-সাময়িকপত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সাংবাদিকতা, সাহিত্যিক ॥

পাদরি জেমস লং লিখেছেন, ১৮২১ সালে কলকাতায় ব্যক্তি-পরিচালিত চারটি ছাপাখানা ছিল। সে চারটি হল: লালবাজারে ‘হিন্দুস্থানী প্রেস’, চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের ‘বাঙালি প্রেস’, পটলডাঙার লল্লু লালের ‘সংস্কৃত প্রেস’ ও শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। এ ছাড়াও আরও দেখা গিয়েছে সেকালে পত্রিকাগুলির নিজেদেরই

---

**অশোককুমার রায়:** কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ: বর্ণময় সাংবাদিকের জীবনালেখ্য
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১০৯-১১৪

মুদ্রণযন্ত্র ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'বেঙ্গল গেজেটি', 'বঙ্গদূত', 'সম্বাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্বর' প্রভৃতির কথা। এই নিবন্ধটির মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে সামান্য পূর্বসূত্রের অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে:

> নাগরিক ও বণিক সভ্যতার প্রসার, শহরজীবী মধ্যবিত্তের ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবিস্তার, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রচলন, ক্লাব ও কফিহাউসের জটলা অপরাপর লোকদের সম্পর্কে সপ্রশ্ন কৌতূহল জাগিয়েছিল ও বাড়িয়েছিল। সাধারণ ও অ-সাধারণ সমকালীন ও ঈষৎ পূর্বজ সর্বস্তরের মানুষের জীবনের তথ্য জানবার আগ্রহ, কোথায় কোন ঘটনা কী করে ঘটল জানবার দুর্নিবার ঔৎসুক্য মিটিয়ে ছিল মুখ্যত সংবাদপত্র, পুস্তিকা, নকশা, জীবনী ও 'ভুয়ো' (pseudo) জীবনী। সংবাদপত্রগুলিতে 'obituary' বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ যখন প্রকাশিত হত, তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত গদ্যে কখনো বা পদ্যে Epitaph গোছের কিছু জুড়ে দেওয়া হত।[১]

বাংলা তথা ভারতবর্ষে সাময়িকপত্রের শুভ সূচনা হিকির 'বেঙ্গল গেজেটি'র (১৭৮৯) মধ্য দিয়ে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' (১৮১৮), সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হত। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরে'র হাত ধরে বাংলা সাংবাদিকতার আধুনিক পর্ব শুরু হয়। এটি মাসিক, সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে। সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। মাসিক পত্রিকাটি ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। এটি চলিত ভাষায় লেখা হত। এটি ছিল সাধারণ মানুষ ও নারীসমাজের জন্য। 'সোমপ্রকাশ' ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকাটি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সমালোচনায় সরব ছিল। 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরে রবীন্দ্রনাথও সম্পাদনা করেছিলেন। 'ভারতী' ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়, এটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। 'সবুজপত্র পত্রিকা' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। নব্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ চালিত রোটারির মেশিন ব্যবহার করে 'দৈনিক বসুমতী' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা সংবাদপত্র আধুনিক অবয়ব পায়। কিন্তু তার মানসমুক্তি ঘটে ১৯২২ সালে ১৩ মার্চ প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মাধ্যমে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লকুমার সরকার। পরে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মোট কুড়ি বছর আনন্দবাজারের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে সন্তোষকুমার ঘোষ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দেন। আর তাঁরই সহযোগিতায় গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী সাংবাদিক পরিমণ্ডল। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি 'যুগান্তর', 'সত্যযুগ', 'মর্ণিং নিউজ', 'নেশন', 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেছেন। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলতেই হয়। তাঁর সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ সন্তোষকুমার ঘোষের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একটু ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গেলে দেখা যাবে সন্তোষকুমার ঘোষের পারিবারিক জীবন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তেমন ভালো ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়তে পড়তেই আর্থিক সংকটের জন্য আর পড়াশোনা চালাতে পারেননি। তাই তাঁকে পড়া ছেড়ে দিয়ে খবরের

কাগজে ঢুকতে হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বসূরী, সমসাময়িক বা পরবর্তী অনেক লেখকের মতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হত না। কিন্তু সেদিকে বেশি গুরুত্ব না-দিয়ে তিনি সাংবাদিকতার পেশাকেই বেছে নিলেন। পরে একসময় তাঁকে আক্ষেপ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে যে এর ফলে তাঁর সাহিত্যজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাইশ বছর বয়সে সংবাদ-তর্জমার কাজে যুক্ত হন। পরে ধীরে ধীরে প্রথম ফ্রন্টের অনুবাদ করার সুযোগ লাভ করেন। তবে অবিকল তর্জমার পরিবর্তে ভাবানুবাদই করতেন বেশি। তাঁর লেখা খরবগুলি হত স্বাধীন আর ভালোবাসায় ভরা। সংবাদ-পরিবেশনকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছেন তিনি। সংবাদপত্রের ছবি, ঘটনাবলি, এমনকী দৈনন্দিন বাচনের মধ্যেও তিনি খুঁজেছেন সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা। অবশ্যই এটি ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতার ফসল ছিল। লেখাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার কথা বলেছিলেন তিনি। বাংলার চেনা প্রতিবেশ ও অভিজ্ঞতার জগতে সংবাদপত্রকে নিয়ে এলেন। 'বর্তমান পত্রিকা'র সম্পাদক কাকলি চক্রবর্তী (সন্তোষকুমার ঘোষের কন্যা) জানিয়েছেন: "তিনি বাস্তববাদী সাংবাদিক। লুকোছাপার ছদ্ম ভণিতা তাঁর নেই।"[২]

লেখার ধরনকে বারবার বদলেছেন তিনি। সমকালের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেন সংবাদপত্রের পাতায়। সংবাদপত্রের শিরোনাম তাঁর কাছে কবিতা হয়ে উঠল। পেজ মেকআপ হয়ে উঠল শিল্প। প্রতিবেদনের মুখবন্ধ হল সুখপাঠ্য ও রমণীয়। স্থান পেল তাতে ভাষার গতিশীলতা ও বিষয়ের আকর্ষণ ।

সন্তোষকুমার খবরের কাগজের অফিসের বাইরে থেকেও হেডিং, পাতা সাজানোর সব কাজ বলে দিতে পারতেন। তিনি পরে তরুণ লেখকদের সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন। এই লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। এই লেখকদের বিভিন্ন পাতার দায়িত্ব দিয়ে সংবাদপত্রের গদ্যভাবনায় পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা তুলে ধরলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে:

> বাংলা সাংবাদিকতার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন তিনি। সাধু বাংলা থেকে চলিত বাংলায় রূপান্তর হয়েছে তাঁর একক উদ্যোগ, শুধু তাই নয়, সাংবাদিকতার ধরন থেকে সম্পাদকীয় রচনা, এমনকী পৃষ্ঠাসাজানো, সবকিছুতেই রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ। আনন্দবাজার পত্রিকার এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের রূপ ক্রমশ অন্যান্য সংবাদপত্রও অনুসরণ করে।[৩]

রিপোর্টার টিমে ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ, অভিতাভ চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন সুখপাঠ্য মানবিক রচনা। যাটের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকা ক্রীড়া-বিষয়ক প্রতিবেদনকে সাহিত্যে উন্নীত করেছে। ক্রিকেট সংবাদ লিখতেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শঙ্করীপ্রসাদ বসু। নন্দাঘুণ্টি অভিযানে পর্বতারোহী হয়ে প্রতিবেদন লিখেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। ওপরের উদ্ধৃত বিষয়গুলি বাংলার আধুনিক সাংবাদিকতার উজ্জ্বল ও গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম দলিল। এসবের আড়ালে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সংবাদকে সুখপাঠ্য ও নান্দনিক করে প্রকাশ করা।

তাঁর সংবাদ পরিবেশনের দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বড়ো খবর হলে সন্তোষকুমার নিজে হেডিং লিখতেন। জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণের পর শিরোনাম রেখেছিলেন: 'নেহরু আর নেই', সঙ্গে ছিল সমুদ্রসৈকতে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা নেহরুর রিয়ার ভিউ ছবি। মানুষের প্রথম

চাঁদের মাটিতে পা দেওয়ার যুগান্তরকারী খবর, যার মূল শিরোনাম ছিল 'মানুষ লঙিঘল আজ নিজ মর্ত্য সীমা'। এভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সংবাদকে সাধারণ মানুষের প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করতেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলেছেন:

> বাংলা সংবাদপত্রে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যে চলিত বাংলায় সংবাদ প্রচার শুরু হল, তার মূলেও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সন্তোষকুমার ঘোষের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াশীলতা ছিল।[৪]

তাঁর উপন্যাসগুলিতে সংবাদপত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তা ব্যক্তি ও পেশাগত সন্তোষকুমার ঘোষকে মনে করিয়ে দেয়। তবে সন্তোষকুমার তো শুধু সাংবাদিকতায় সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাননি, তিনি স্বতন্ত্র আরও বহুবিধ ব্যসনে— রবীন্দ্রভক্ত, উপন্যাসের কাহিনিনির্মাণে, ভাষা ও শৈলী উপস্থাপনে। তাঁর লেখার পরিসরকে অনেকটা সংকুচিত করেছে সাংবাদিকতার জীবনযাত্রা। ব্যক্তিগত পেশার চালচিত্র তাঁর উপন্যাসের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে। তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে সাংবাদিকতা প্রসঙ্গটি ঘনঘন এসেছে।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে দেখা গিয়েছে ইন্দ্রজিৎ ছাপাখানার কাজে যুক্ত ছিলেন। বেকার যুবক ইন্দ্রজিৎ এই পেশাকে অবলম্বন করেই জীবনধারণ করতে চেয়েছে। অনেক ভাঙাচোরা সময়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলতে হয়েছে ইন্দ্রজিৎকে। সম্ভবত তাঁর নিজের জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এই চরিত্রে। এই উপন্যাসটির আরেকটি চরিত্র শশাঙ্ক চৌধুরী। তার ভাবনায় ছিল "ভাল একখানা মাসিকপত্র বের করবেন তিনি।" শশাঙ্ক তার ভাবনাকে ব্যক্ত করেছে ইন্দ্রজিতের কাছে। শশাঙ্কের আলোচনায় ইন্দ্রজিৎ পত্রখানির সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করতে রাজি হয়। অর্থনৈতিকভাবে অসহায় হয়ে পড়া ইন্দ্রজিৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা পেতে চেয়েছিল সেই দায়িত্ব নিয়ে। উপন্যাসে পরে দেখা গিয়েছে শশাঙ্কবাবুর ইচ্ছে হয়েছিল সিনেমার ছবিওয়ালা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র প্রভাকর। তার নিজের ছাপাখানা ছিল। সংবাদপত্র নিয়ে পঞ্চাশের দশকে নিশ্চয়তা ছিল না। লেখক তাঁর চরিত্রের অভিজ্ঞতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে জানিয়েছেন: "কী ভবিষ্যৎ ওসব কাগজের? ক'জন কেনে। সমঝদারই-বা ক'জন?"[৫]

সংবাদপত্রগুলিতে উঠে আসে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ, খেলা, বিনোদন, জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি। কিনু গোয়ালার গলি থাকবে না— এ বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে কাগজে। দেবব্রত ও নীলার কথায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে: "আজকের কাগজে লিখেছে এই গলি আর থাকবে না?"[৬]

'নানারঙের দিন' উপন্যাসে দেখা গিয়েছে সমসাময়িক কলকাতার সংবাদপত্রগুলি গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত। লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ জানতেন গ্রামে শতকরা যাটজনের কাছে সংবাদপত্র পৌঁছত না। সেই বিষয়টি দেখানোর প্রয়াস করেছেন উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসে দেবাশিসকে খবরের কাগজ কিনতে দেখা গিয়েছে। দেবাশিসের কেনা সংবাদপত্রটিতে এক মৃত্যু-সংবাদ ছিল। সংবাদপত্রের একটি বিশেষ বিষয় হল জীবনবৃত্তান্ত উপস্থাপন করা।

'সুধার শহর' উপন্যাসে ইলেকশন প্রতিনিধি আদিত্য মজুমদার সম্পর্কে দু-চার কলম স্তুতিবাক্য লেখা যাতে হয় সেজন্য 'জনদর্পণ' সংবাদপত্রের অফিসে অতসীকে যেতে বলেন আদিত্য মজুমদার। সেখানে যাওয়ার প্রসঙ্গ উপন্যাসে উল্লেখ আছে। সংবাদপত্রের অফিসের খণ্ড চিত্র ধরা পড়ে অতসীর চোখে। অতসী সেখানে গিয়ে দেখেছে জীবনতোষ সরকার সম্পাদকীয় লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের পার্থক্য

সকলের জানা। অতসী অফিসে গিয়ে পাশের ঘরে খটখট টাইপের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। খবরের কাগজ প্রকাশের ঘর আলাদা হত। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ঘর আলাদা হত— উপন্যাসে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে। সন্তোষকুমার বাংলা সংবাদপত্রের অন্দরমহলেরবাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। একসময় দেখা গিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে সংবাদপত্রগুলি। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বিষয়ক মতামত প্রকাশিত হত সংবাদপত্রে। সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: ‘‘তিনি যে নতুন সাংবাদিকতা র স্বপ্ন দেখেছিলেন তা লেখক হিসাবে বাঙালি পাঠকের মন বোঝার সহজাত ক্ষমতা থেকে...।’’[৭]

‘জল দাও’ উপন্যাসটি খবরের শিরোনাম দিয়েই শুরু হয়। খবরের শিরোনামটি ছিল ‘পিপাসায় এক ব্যক্তির মৃত্যু’। উপন্যাসে পাওয়া গিয়েছে ‘মরমী পত্রিকা’র কথা এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মৃগাঙ্কমোহন। সমকালীন সংবাদপত্রের অফিসে এক জীবন্ত আলেখ্য ধরা পড়ছে শ্রীতিমিরকুমার চাকলাদার ও সম্পাদকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে সামান্য অংশ তুলে ধরা যেতে পারে:

— দেখবেন না?

— না। নতুন লেখা আমরা দেখিনা।

— ভাল হলেও না

— না। চান্স নেই। ওই দেখুন না, মনোনীত রচনা ও ফাইলবন্দি ডাঁই![৮]

‘স্বয়ং নায়ক’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সমকালীন সংবাদপত্রে গরম গরম সংবাদের শিরোনামে থাকত যেসব বিষয়, তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন: ‘‘বোমার ষড়যন্ত্রের কয়েকটি খবর পড়েছিলাম, নারী ধর্ষণ আর বোমা দু-রকম মামলাই তখন পাশাপাশি খুব ফলাও করে ছাপা হত।’’[৯]

সাংবাদিকসুলভসূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে। সংবাদপত্রকে নিয়ে গিয়েছে অন্যমাত্রায়। এর পিছনে ছিল তাঁর একনিষ্ঠ পরিশ্রম সততা ও একাগ্রতা। একসময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন সাংবাদিকতায়। জনৈক সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে: ‘‘সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-৮৫) বাংলা সংবাদপত্রে কথ্যভাষায় রিপোর্ট লেখার ধারা প্রবর্তন করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে পরে সংযুক্ত সম্পাদক হন।’’[১০]

তিনি সংবাদপত্র ও তরুণ সম্পাদকদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন বলা যেতে পারে। সামাজিক দায়বোধে সংবাদপত্রগুলিকে দৈনন্দিন বাচনের মধ্য দিয়ে পাঠকসমাজে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে ছিল সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞান।

সূত্র

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ‘বাংলা চরিত সাহিত্য’, কলকাতা: দে’জ, ১৯৮২, পৃ. ৭১।

২. শুভাশিস চক্রবর্তী, ‘সন্তোষকুমার ঘোষ জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ’, কলকাতা: উড়োপত্র, ২০২১, পৃ. ২৭০।

৩. সন্তোষকুমার ঘোষ, ‘উপন্যাস সমগ্র’ ১, অলোক চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা: আনন্দ, ২০১১, পৃ. ভূমিকা।

৪. রমেনকুমার সর (সম্পা), 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৪২৬ ব., পৃ. ১২৮।

৫. সন্তোষকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

৬. তদেব, পৃ. ১০১।

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ‟সন্তোষকুমার ঘোষ”, 'দেশ', ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৮৩।

৮. সন্তোষকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৫।

৯. তদেব, পৃ. ৬২৫।

১০. রবিশংকর বল ও কুশল রায়, ‟অসীম রায়: জীবন-মৃত্যু এক”, কলকাতা: ৯ঋকাল বুকস, ২০১৮, পৃ. ৭০।

# *সোনার সিঁড়ির উপকথা:* লোককথার খণ্ড চিত্র

তপতী দত্ত ।। প্রসূন বর্মন

সারসংক্ষেপ

অঞ্জলি লাহিড়ীর (১৯২২-২০১৩) 'সোনার সিঁড়ির উপকথা' উপন্যাসে খাসিজীবনের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির বৈভব ছড়িয়ে আছে। মেঘালয়ের অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা— তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, লোকক্রীড়া, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোকছড়া, লোকাচার, লোকউৎসব, প্রবাদ, বিশ্বাস, মন্ত্র, লোককথা, কিংবদন্তি প্রভৃতির বিস্তৃত ও নিখুঁত বর্ণনা উপন্যাসটির অন্যতম সম্পদ। লোককথা আর কিংবদন্তি কীভাবে উপন্যাসকাহিনিতে বিবৃত হয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করাই বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসটিতে মাতৃতান্ত্রিক খাসিসমাজের চিত্র-বিচিত্র কাহিনি কীভাবে অঞ্জলি চিত্রিত করেছেন, সে কথাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে এ সন্দর্ভে। সমস্ত আলোচনাই ঔপন্যাসিকের বয়ান এবং খাসি লোককথা ও কিংবদন্তির আলোয় বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

বীজশব্দ: অঞ্জলি লাহিড়ী, উত্তরপূর্ব ভারত, উপন্যাস, কিংবদন্তি, খাসি, লোককথা ।।

## ভূমিকা

কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে লোককথা ও লোকঐতিহ্যের আশ্রয় নেন অনেকেই, পুনর্নির্মাণ করেন তার বয়ানকে। মুখে মুখে প্রচলিত সহজ-সরল গল্পকথার মধ্য দিয়ে লেখক তুলে ধরেন সেই সব কাহিনি, যা তাঁর উদ্দিষ্টকে সফল করে তোলে। এসব কাহিনির মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেন

**তপতী দত্ত ।। প্রসূন বর্মন :** *সোনার সিঁড়ির উপকথা:* লোককথার খণ্ড চিত্র
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১১৫-১২৩

জনগোষ্ঠীয় ইতিহাসকে, তার অগ্রসরের ইতিকথাকে। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) যেভাবে ভেবেছেন কিংবা যেভাবে চিনুয়া আচেবে (১৯৩০-২০১৩) প্রান্তীয় জীবনকে আলোকিত করেছেন, শিলং-দুহিতা অঞ্জলি লাহিড়ীও সেই শৈলীই অনুসরণ করেছেন।

অঞ্জলি লাহিড়ীর শেষ উপন্যাস 'সোনার সিঁড়ির উপকথা'। গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ লহরী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ২০১১ সালের অগস্ট মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'নীরেন লাহিড়ীর স্মৃতিতে'। উপন্যাসের নায়ক জোয়াই দেশের 'সিন্টেং' গোষ্ঠীভুক্ত পনারভাষী রাপলাং রিম্বাই, নায়িকা লিংডো পরিবারের যুবতী থিরিশিয়া। তাদের প্রেম-ভালোবাসা আর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেখক প্রকাশ করেছেন নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের। এই প্রেক্ষিতেই বারবার উঠে এসেছে খাসি লোককথা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় সম্ভারের রূপ-চিত্র।

## সোনার সিঁড়ি ও লুমসাম্পার

'সোনার সিঁড়ির উপকথা' উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যে রয়েছে একটি খাসি কিংবদন্তি। খাসি লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর এই সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার পাশাপাশি ষোলো ঘর মানুষের পরিবারও গড়ে তুলেছিলেন। তারাও ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গেই বসবাস করতেন। তবে লুম সোফেটে অবস্থিত সোনার সিঁড়ির সাহায্যে প্রায়ই পৃথিবীতে নেমে আসতেন তারা। কাজ শেষে আবার ফিরেও যেতেন। এই সিঁড়িই ছিল পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগের পথ।

একদিন তাদেরই কয়েকজন মর্ত্যে বসবাসের জন্য ঈশ্বরের অনুমতি চাইলেন। তারা এও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর দেখাশুনা করবেন এবং ন্যায়-শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। ঈশ্বর তখন সাতটি পরিবারকে পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দিলেন। তারাই খাসি, পৃথিবীর আদি বাসিন্দা। কিন্তু হঠাৎই এক কপটের চক্রান্তে তারা সোনার সিঁড়ির গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যতই কাটে, পরদিন আবার শাখা-প্রশাখা প্রলম্বিত করে সতেজ হয়ে ওঠে গাছটি। কীভাবে রোজ কাটা গাছটি আবার ডাল-পালায় ভরে ওঠে, তা বলে দেয় ফ্রেইট পাখিটি। একটি বাঘ রাতে এসে গাছের কাটা অংশটি চেটে যায়, তাই সে আবার জেগে ওঠে। এ গোপন কথাটি জানতে পেরে তারা কৌশলে বাঘটিকে তাড়িয়ে দেয় আর গাছটিকে চিরকালের জন্য কেটে ফেলে।

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে নায়িকা থিরিশিয়ার জ্যাঠামশাই পাসানের মুখে এই কিংবদন্তিটির কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক।[১] তবে উপন্যাস-কাহিনিতে প্রথম কিংবদন্তির উল্লেখ রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। 'লুমসাম্পার' পাহাড়কে ঘিরে এই কিংবদন্তিটি লেংখার পথে যেতে যেতে রাপলাংকে শুনিয়েছিল মাঝবয়সী বাখ্‌লিন। পুরাকালের বহু কিংবদন্তি জড়িয়ে আছে এই পাহাড়কে ঘিরে:

> পুরাকালে এই পাহাড় শুধু উড়ে বেড়াত। একদিন আকাশে গিয়ে ঠেকে তার মাথা। পশ্চিমের খাড়্‌সাওফ্রা গ্রামের বিরাট শক্তিশালী পাহাড় লুমক্যেল্লান। তিনি যুদ্ধের দেবতা। লুমসাম্পারের এই ঔদ্ধত্য তার সহ্য হয় না। অসীম তাঁর শক্তি; তাঁর বুকেই জন্ম নেয় সাইক্লোন, শিলং পিক দুহিতা উমঙ্গট তাঁর প্রেয়সী। লুমসাম্পারের এই

> বেড়ে ওঠার স্পর্ধা দেখে লুমক্যেল্লান ছুড়ে মারলেন বড়ো বড়ো পাথরের গোলা লুমসাম্পারের বুক লক্ষ করে। বড়ো বড়ো ক্ষত চিহ্ন বুকে ধারণ করে লুমসাম্পার লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললেন।[২]

## মাওবিন্না বা মনোলিথ

মনোলিথ নিয়ে প্রচলিত লোককথাটিও শুনিয়েছে পাসান। ডিসেম্বরের এক হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার রাতে হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি, কোটের ওপর এণ্ডির চাদর জড়িয়ে থিরিশিয়াদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় পাসান। প্রচণ্ড শীতে সবাই যখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে, তখন পাহাড় ডিঙিয়ে এতটা পথ হেঁটে, নিশ্বাস দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আর পান চিবোতে চিবোতে পাসানের আগমন। বয়স্ক, আঁটোসাঁটো গড়নের পাসান লাঠি ঠুকঠুক করে আজ এ-বস্তি, কাল ও-বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়। তার ঝুলিতে সব পুরানো দিনের কাহিনি। এত শীতের রাতে তাকে এভাবে উপস্থিত হতে দেখে সবাই একটু অবাক হলে তিনি বলেন:

> আরে আমি হলাম গিয়ে সে-যুগের মানুষ। আমাদের সময় দেখেছি আকাশ থেকে পেঁজা তুলোর মতো বরফ ঝরে পড়ত। এখন তো হিম জমে এক পরত পাতলা বরফ। এতেই তোমরা শীতে কাবু। এমন দিনেই তো গরম চায়ের সঙ্গে আড্ডাটা জমে ভালো।[৩]

শুরু হয় তাঁর গল্প বলা, যা তিনি ছেলেবেলায় মায়ের কাছে শুনেছিলেন। মনোলিথ বা মাওবিন্নাকে নিয়ে অনেক গল্পই রয়েছে। খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের এই পাথরের স্মৃতি স্তম্ভগুলোই এখানকার সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন চিহ্ন। মাওবিন্না প্রসঙ্গে পাসানের উক্তি:

> আমাদের অতীতের আয়না কিন্তু এই পাথরের স্মৃতিফলকগুলোই। দেখিসনি খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের আনাচেকানাচে, পাহাড়ের চূড়ায়, ঘন জঙ্গলে, পাহাড়ে চলার পথে পথে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইট পাথরের ওই মস্ত মস্ত স্তম্ভগুলো। নির্জন পাহাড়ে বস্তিতে প্রায়ই দেখা যায় তিনটে, পাঁচটা বা সাতটা করে খাড়া পাথর (মেনহির) আর সামনে মাপে-কাটা টেবিলের মতো শোয়ানো পাথর (ডলমেন)। একবার তোদের জোয়াইয়ের নরতিয়াঙে নিয়ে যাব। ওখানকার মাওবিন্না শুনেছি হাজার বছরের পুরনো। কী বিরাট পাথর, সাতাশ ফুট উঁচু, ছয় ফুট চওড়া, প্রস্থে আড়াই ফুট। শুনেছি মহাবীর মারফালিংকি ওই পাথর খাড়া করেছিলেন।[৪]

পাসানের মুখে অঞ্জলি যে কথা শুনিয়েছেন, তা সর্বত্রই আলোচিত ও সমর্থিত।[৫] এমনই এক স্মৃতিস্তম্ভ ছিল চেরাপুঞ্জির লাইডু গ্রামে। তা নিয়েই পাসান ছেলেবেলায় মায়ের কাছে শুনেছিলেন আরেকটি গল্প। গল্পটি এরকম: রাজা স্থির করলেন মাওবিন্না অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু সে পাথর আর নড়ে না। গ্রামসুদ্ধু লোক এসে টানাহ্যাঁচড়া করে। পাথর কিন্তু স্থির। রাজা তখন রুপোর চেন দেওয়া চুনের কৌটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। হঠাৎ কৌটোটি থেমে যায়, তার মাথা অর্থাৎ ঢাকনিটা পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল রাজকর্মচারী। তাকে হুকুম দেওয়া হল কৌটোর ঢাকনিটা কুড়িয়ে আনতে। লোকটি যেই-না গর্তে নেমেছে, স্থির মাওবিন্না নড়ে ওঠে সেই গর্তে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাজকর্মচারীটি চাপা

পড়ে যায় মাওবিন্নার নিচে। শেষ অবধি মানুষের রক্তেই মাওবিন্না দাঁড় করানো সম্ভব হয়ে ওঠে।[৬]

## ভাষা-বর্ণ, মন্দির আর পবিত্র মোরগ

খাসি জনজীবনের সূত্রপাত, তাদের গড়ে তোলা পাথরের সভ্যতা প্রভৃতির বিষয়ে একের পর এক গল্প ও কিংবদন্তি শোনাতে থাকে পাসান। খাসিদের প্রাচীন ভাষা-বর্ণ আর তাদের ইতিহাস কীভাবে বিলুপ্ত হয়েছে, সে কথাও শুনিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বহুযুগ পূর্বে পাসান তার দাদু-দিদিমার মুখে শুনেছিলেন সে কাহিনি। কাহিনিটি: একবার প্রচণ্ড বন্যায় ভেসে গেল সমস্ত দেশ। চারদিকে জলে থইথই। খাসিদের মাতব্বরের হাতে ছিল সেই অমূল্য প্রাচীন ভাষার লিপি, যেখানে লিপিবদ্ধ ছিল তাদের পুরোনো দিনের কথা। অতীত যুগের 'ইয়াও বেই তিনরাই' ছিলেন খাসিদের আদি মাতা-গোষ্ঠী, বংশ সৃষ্টির মূল শিকড়, যার থেকে ডালপালা ছড়িয়ে তৈরি হয়েছে আজকের খাসি সমাজ। খাসি সমাজের পুরোনো সব গাথা-কাহিনি, ভাষা-লিপি, ইয়াও বেইয়ের নাম— সবই লিপিবদ্ধ ছিল সেই আদিতম গ্রন্থে। একবার প্রবল বন্যার কবলে পরে সমাজের প্রধান ভাবলেন যে দলিল যদি জলে ভেসে যায়, তাহলে সব ইতিহাস মুছে যাবে চিরকালের জন্য। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সে দলিল মুখে ভরে নিলেন। তারপর সাঁতরে যখন ডাঙায় পৌঁছলেন, দলিল তখন হজম হয়ে গেছে। ন্যাতা হয়ে একেবারে মাতব্বরের পেটের ভিতর। বন্যার কবলে পড়েছিল সমতলের দেশও। কিন্তু তাদের প্রধান বা মাতব্বরের চুল ছিল লম্বা। তাই বুদ্ধি করে তিনি চুলের মধ্যেই বেঁধে নিয়েছিলেন তাদের আদি গ্রন্থ। তিনি যখন সাঁতরে ডাঙায় ওঠেন, তখন সে দলিল দিব্যি রয়ে যায়। এভাবেই সমতলবাসীর প্রাচীন লিখিত ঐতিহ্য রক্ষা পেয়েছে কিন্তু খাসিদের সে ইতিকথা হারিয়ে গেছে।[৭]

মিসেস র‍্যাফির লেখা 'Folk Tales of the Khases' গ্রন্থের 'The Lost Book' গল্পটিও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। মিসেস র‍্যাফি সেখানে এর পরবর্তী ঘটনাক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> When he reached his own country, he summoned together all his kindred and told them all that had happened. They were very sad when they heard that the book was lost, and bewildered because they dad no means of enlightenment. They resolved to call a Durbar of all the Khasis to consider how they could carry on their worship in a becoming way and with some uniformity, so as to secure for themselves the three great blessings of humanity— health, wealth, and families.
>
> Since that day the Khasis have depended for their knowledge of sacred worship on the traditions that have come down from one generation to the other from their ancestors who sat in the great Durbar after the sacred book was lost, while the foreigners learn how to worship from books.[৮]

কথক পাসান কামাখ্যা মন্দির নিয়েও একটা ছোট্ট কাহিনি শুনিয়েছিলেন থিরিশিয়াদের। সেটি: খাসিদের

পূর্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্বে মেকঙের কোনো এক উপত্যকা থেকে যাত্রা শুরু করে চলতে চলতে যখন ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে উপস্থিত হয়, তখন সেই নদী, এর তীরবর্তী পাহাড়, বালুর চর, চারপাশের গাছ-গাছালির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানেই বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নদী তীরবর্তী নীলাচল পাহাড়ের বুকে গড়ে ওঠে খাসি জনবসতি। তখন বুনো হাতি, বাঘ, চিতা, অজগর, গোখরো প্রভৃতি কত যে হিংস্র জন্তু আর প্রাণী ছিল। সবার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা তো আর সহজ কথা নয়। তখন সবাই উপলব্ধি করলেন এবার তাদের একজন জাগ্রত ঈশ্বর দরকার— আর কতদিন এভাবে সকলের তাড়া খেয়ে বেড়াবেন। ফলে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে তারা তৈরি করলেন এক মন্দির। নাম রাখলেন: ‘কা মেই খা’র (জন্মদাত্রী মায়ের) মন্দির। এরপর কিন্তু সেই মা খাসিদের আর রক্ষা করতে পারলেন না। এখানকার আদিবাসী বলে দাবী করা বোড়োরা তাদের মেরে তাড়িয়ে দিল।[৯] উপন্যাসে বর্ণিত এই কাহিনির সমর্থন পাওয়া যায় বাণীকান্ত কাকতির (১৮৯৪-১৯৫২) রচনায়।[১০]

খাসি সমাজে মোরগকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং সেখানে মোরগের বলি দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তর্পণের প্রথা প্রচলিত। এর পিছনেও রয়েছে একটি কিংবদন্তি, যা পাসান শুনিয়েছিলেন। কিংবদন্তিটি: সৃষ্টির আদিতে সব জীবিত প্রাণীই একসঙ্গে মিলে নাচ-গান করত। একদিন চাঁদ আর সূর্য নেমে এলেন আকাশ থেকে একসঙ্গে নাচ-গান করবেন বলে। চাঁদ ভাই, সূর্য বোন। তারা দুজন যখন হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করলেন, তখন কিছু মানুষ নিজ মনের কলুষতাবশত ভাই-বোনের একত্রে নাচ অশুভ বলে আপত্তি প্রকাশ করল। এতে সূর্য অত্যন্ত রেগে গিয়ে ‘কা ক্রেম কা লাতাং’ গুহায় নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। ফলে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। সমস্ত প্রাণী জগৎ মাথায় হাত দিল— কী করে সূর্যের অভিমান ভাঙানো যায়। অনেকেই অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তারপর এগিয়ে গেল ধনেশ পাখি। সে গুহায় গিয়ে ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করলে সূর্য প্রচণ্ড রেগে এক কাঠের চৌকি তার মাথায় ছুড়ে মারলেন। সেই থেকে তার ঠোঁটে একটা কালো দাগ হয়ে গেল। অবশেষে এল সম্পূর্ণ নিরাভরণ মোরগ। সব জীবজন্তুরা তাকে রঙিন পালকে সাজিয়ে দিয়ে বলল— যাও, এবার তুমি দেখো সূর্যের মান ভাঙাতে পারো কি না। তখন সেই মোরগ বলল— আমি সামান্য জীব। কিন্তু আমি তাঁর অনুগত। তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যদি আমার প্রাণও দিতে হয়, সেজন্যও আমি প্রস্তুত। এই অনুগত ছোট্ট প্রাণীটির ভালোবাসা সূর্যকে আকৃষ্ট করল। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকার পৃথিবীকে আলোয় ভরিয়ে দিলেন তিনি। এজন্যই খাসিসমাজ মোরগকে পবিত্র বলে মনে করে।[১১] এই লোককথার সঙ্গে মিল রয়েছে ‘বেলি আরু কুকুরা’ গল্পটিরও।[১২]

## লা পা সিন্তিউ

এরপর এসেছে খাইরিম ও মিল্লিমের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার কাহিনি। পাহাড়-দেবতার বড়ো মেয়ে ‘লা পা সিন্তিউ’ কীভাবে খাসি রমণীর মূর্তি ধরে নেমে এসে দেববংশের প্রতিষ্ঠা করলেন তার কাহিনি।[১৩] খাসি সমাজের উদ্ভব এবং মেঘালয়ে তাঁদের আগমন ও বসতি স্থাপন সম্পর্কেও এক বিস্তৃত কাহিনি শোনা যায় পাসানের মুখে। এশিয়ার পুবদিকের ইন্দোচিনের মন আন্নাম জনগোষ্ঠীর লোকেরা চলতে চলতে একদিন মেকং আর মেনাম বলে এক উপত্যকায় এসে হাজির হয়। সেখান থেকে জিশুখ্রিস্টের জন্মের বহু বছর আগে আরও পূর্বদিকে চলে আসে। এই খাসিদের আগমন সম্পর্কে নানাজনের নানা মত রয়েছে। তবে খাসিদের এই পূর্বপুরুষেরা পাথরের এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। যে পথ দিয়ে তারা এসেছিল, সেই সব পথে ছড়িয়ে রয়েছে

নানারকম পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ, যা খাসিদের আদিম সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো স্মৃতি চিহ্ন। যাই হোক, পূর্বে ছিল পাটকাই পাহাড়ের ঘন জঙ্গল, ভয়ংকর জীবজন্তু হিংস্র মানুষ। বহু সঙ্গীকে হারিয়ে নানা কষ্টে সেসব স্থান অতিক্রম করে তারা এগিয়ে গেল আরও উত্তরে। এভাবে এগোতে এগোতে একদিন তারা এসে উপস্থিত হয় লুইতের পারে। আস্তানা গড়ার ইচ্ছে থাকলেও সেখানকার ভূমিপুত্র চুতিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই বাঁধে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সেখান থেকে আবার চলতে আরম্ভ করে। এভাবে অনেক দেশ পেরিয়ে অবশেষে একদিন এসে পৌঁছোয় ব্রহ্মপুত্রের পারে। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে অবস্থিত নীলাচল পাহাড়ে গড়ে তুলল বসতি। প্রতিষ্ঠা করল 'কা মেই খা'র মন্দির। কিন্তু সেখান থেকেও বোড়োদর দ্বারা বিতাড়িত হল তারা। সব কিছু পেছনে ফেলে আবার পথে নামল। এবার সেই দলটি ভাগ হয়ে গেল তিন ভাগে। একদল উত্তর থেকে দক্ষিণে, আরেক দল গারো পাহাড়ের দুর্লঙ্ঘ্য জঙ্গল আর গিরিখাদ পেরিয়ে পশ্চিমের পথে চলল। এবং তৃতীয় দল কপিলির পার ঘেঁষে রওনা দিল পুবদিকের জয়ন্তিয়া পাহাড়ে। এভাবে চলতে চলতে একদল এসে উপস্থিত হল এক নতুন দেশে— বিরাট বিরাট গিরিখাদ, উঁচু উঁচু পাহাড়, মেঘ আর রামধনু। সেখানে উপনীত হয়ে মাতব্বর ও দলের সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: "রক্ত ঝরা দীর্ঘ পথ চলার পর এতদিনে বুঝি দেখা দিল পৃথিবীর বুকে এক নতুন স্বর্গরাজ্য।"[১৪]

## সোনার সিঁড়ি

অতঃপর এসেছে সোনার সিঁড়ির কাহিনি। স্বর্গের ষোলো ঘরের সঙ্গে তাদের পরিচয়, তাদের ষোলো ঘরের সঙ্গে সামিল করে নেওয়ার জন্য মাতব্বরের অনুরোধ। তারপরই ষোলো ঘরের দেওয়া শর্ত মেনে নিজেদের সমস্ত অতীত ভুলে তাদের আদিমাতা 'সি'-র বিধান মেনে তারা ষোলো ঘরের সঙ্গে মিশে গেল এবং তখন থেকেই তাদের নাম হল 'খাসি'।[১৫]

থিরিশিয়ার দিদিমা 'বেই'র মুখে বর্ণিত হয়েছে উ-থ্লেনের গল্প। খাসি বিশ্বাসানুযায়ী, "ভগবান এক উনংবু, উনংথাও, যাঁর ইচ্ছেতে পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।" তবে তিনি একা কোন দিক সামলাবেন। তাই হালকা কাজের জন্য তিনি বেশ কয়েকজন ছোটোছোটো দেবতা, উপদেবতা ও প্রেতাত্মার সৃষ্টি করেন। এই দেবতাদের মধ্যে চেরার উ মওলাং সিয়েমের নাম সবাই জানে। তাঁর এক মেয়ে ছিল 'কাকমা খারাই', তাকে অনেকে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু তার বাবা রাজি হতেন না। একবার খারাই 'উমওয়েই'য়ের দেবতার প্রেমে পড়ে। কিন্তু তাতেও তার বাবা আপত্তি জানালে খারাই তখন রেগে গিয়ে বাজে লোকের সঙ্গে ভাব করতে শুরু করে। এরপরে একদিন যখন সে বুঝতে পারে যে সে সন্তানসম্ভবা তখন সে বাবার ভয়ে লুকিয়ে পামদলুই গুহায় মামার কাছে চলে যায়। তার মামা ছিল ইয়াক জাকর (দানব) নামের এক বিরাট ড্রাগন। সেই গুহায় কাকমা খারাই এক ছেলের জন্ম দেয়। সেই ছেলে তো আসলে মানুষ নয়, এক বিরাট মানুষ খেকো সাপ। মানুষের রক্ত ছাড়া আর কিছুই সে খায় না। এই ছেলের নাম উ-থ্লেন। উ-থ্লেন তার মায়ের মতো যখন-তখন রূপ বদলাতে পারত না, কিন্তু আকার বদলাতে পারত। কখনো সুতোর মতো ছোট্ট সরু, আবার কখনো পাহাড়ের মতো বিশাল। একটা আস্ত মানুষকে সে গিলে খেতে পারত। এই উ-থ্লেন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে যখন বহু মানুষ মারা যেতে লাগল, তখন মানুষ উত্যক্ত হয়ে উ-মাওলং রাজার কাছে গেল (সে-যুগে ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত)। তখন তিনি সব দেবতাদের এক দরবার ডাকলেন। উ-থ্লেনকে একেবারে

প্রাণে মারার নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না। হাজার হোক, সে তো তাঁর নাতি। তাই তিনি উ-থ্লেনকে নির্দেশ দিলেন: সে যে ক'জন মানুষ ধরবে, তার অর্ধেক সে খাবে, বাকি অর্ধেক ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু অর্ধেক সংখ্যক মানুষ ছাড়া পেলেও বাকি অর্ধেক তো তার পেটে যাচ্ছে— তার সংখ্যাও তো কম নয়। এভাবে বহু মানুষের জীবন চলে যাওয়ায় বংশ রক্ষা করাই যে মানুষের জন্য মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে 'লেইট রিংগিউ' জঙ্গলের উ-সুইদন নামক জাকর (দৈত্য) এর সঙ্গে দেখা করে ও নিজেদের বিপদের কথা বলে। তারা উ-সুইদনকে অনুরোধ করে, যে করেই হোক উ-থ্লেনকে মারার জন্য। উ-সুইদন এসে উ-থ্লেনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই বুদ্ধি প্রয়োগ করে উ-থ্লেনকে হত্যা করে। চারদিকে খবর রটে গেলে সবাই মিলে যায় উ-থ্লেনকে দেখতে, বিরাট দরবার ডাকা হয়। সমতল থেকেও লোক আসে। গুহা থেকে টেনে বের করা হয় মৃত উ-থ্লেনকে। ঠিক করা হয় উ-থ্লেনের মাংস অর্ধেক খাবে সমতলের লোকেরা, আর বাকি অর্ধেক খাসিরা। সমতলের লোকদের খাওয়া শেষ, খাসিদেরও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এমন সময় একজন স্ত্রীলোক এসে তার ছেলের জন্য, যে কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকায় আসতে পারেনি, হাঁড়িতে কাপড় দিয়ে ঢেকে মাংসের ভাগ বাড়িতে নিয়ে যায়। ছেলে হাঁড়ি খুলতেই দেখে হাঁড়ির মধ্যে সাপের বাচ্চা কিলবিল করছে। ওই এক টুকরো উ-থ্লেনের মাংস থেকে জন্মেছে অসংখ্য উ-থ্লেন। এই উ-থ্লেনের বংশধরেরা এখনও ছড়িয়ে আছে চেরাপুঞ্জি, মিল্লিম, নংক্রেম রাজ্যে। তারপর একে একে তারা আশ্রয় নিয়েছে একেকটি পরিবারে। এই উ-থ্লেন যে পরিবারে আশ্রয় নিয়েছে, সাধ্য কী তার হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু উ-থ্লেন যে পরিবারে ভর করে তারা টাকা-পয়সা-সম্পত্তিতে পয়মন্ত হয়ে ওঠে। তবে তার বদলে সেই পরিবারকে এনে দিতে হয় মানুষের রক্ত। আর ইচ্ছাকৃতভাবে উ-থ্লেন যে পরিবার ছেড়ে চলে যায়, তাদের ধনে-মানে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যায়। যে পরিবারে উ-থ্লেন আশ্রয় নেয় আর যখন সে বাড়ির কারও কঠিন অসুখ হয় কিংবা দিন দিন কেউ শুকিয়ে যেতে থাকে অথবা অর্থহানি হতে থাকে, তখন সকলেই বুঝতে পারে উ-থ্লেন ক্ষুধার্ত, রক্তের পিপাসা হয়েছে। ডাক পড়ে নংসানোদের। পাঠানো হয় তাদের রক্তের খোঁজে। তারা সুযোগের সন্ধানে থাকে। আর কোনো নির্জন স্থানে কোনো মানুষকে একা পেলে তার নাকের মধ্যে ধারালো নল ঢুকিয়ে রক্ত টেনে বাঁশের চোঙায় ভরে নেয়। আর যদি রক্ত পাওয়া না-যায়, তবে কোনো ব্যক্তির চুল, নখ বা কাপড় এনে উ-থ্লেনের কাছে নিবেদন করা হয়। গভীর অন্ধকারে উ-থ্লেনের পুজোর আয়োজন করা হয়। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিয়ে ঘরের মেঝেতে দামি কাপড় বিছিয়ে একটা কাঁসার থালায় মানুষের রক্ত রাখা হয়। পরিবারের সবাই এসে জমা হলে একটা ছোট্ট ড্রাম বাজিয়ে উ-থ্লেনের কাছে সম্পত্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হয়। তখন ধীরে ধীরে লুকোনো জায়গা থেকে একেবেঁকে উ-থ্লেনের আবির্ভাব হয়। ছোটো সাপ ধীরে ধীরে বিরাট পাহাড়ের রূপ নিয়ে থালার সামনে আসে। যার রক্ত, কাপড় বা চুল থালায় রাখা হয়েছে তার আত্মা থালার ওপর এসে হাসতে থাকে। ধীরে ধীরে উ-থ্লেন তাকে খেয়ে ফেলে। তখন সেই অশরীরী দেহের সত্যিকারের মৃত্যু হয়। এই হচ্ছে উ-থ্লেনের কাহিনি।[১৬] 'Folk Tales of the Khases' গ্রন্থের অন্তর্গত ১২ সংখ্যক গল্প 'U Thlen, The snake— Vampire'-এর সঙ্গে অঞ্জলি লাহিড়ীর এই বর্ণনার মিল রয়েছে। এখানে উ-থ্লেনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> U Thlen is one of the Legendary Khasi gods, whose worship is limited to a few clans and families. From participation in it all right-

thinking Khasis recoil with loathing and horror, inasmuch as it involves the perpetration of crimes, for this god can only be propitiated by offerings of human sacrifices, with many revolting and barbaric rites.

The clans who are reputed to be the devotees and worshippers of the Thlen are regarded with aversion and fear throughout the country, and to them are attributed many kinds of atrocities, such as the kidnapping of children, murders and attempted murders, and many are the tales of hair-breadth escapes from the clutches of these miscreants, who are known as Nongshohnohs.[১৭]

## কা-সিঙ্গাই

উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে বেইর কাছ থেকে শোনা আরেকটি লোককথা শুনিয়েছে থিরিশিয়া। আগে নাকি পৃথিবীটা ছিল সমতল। একটা পাহাড়ও ছিল না। এখানে তখন তিন দেবী থাকতেন। একজন কা-ডিং (আগুন), অন্যজন কা-উম (জল) আর তৃতীয়জন কা-সিঙ্গাই (সূর্য)। একদিন এই তিন মেয়ের মা স্বর্গ থেকে নেমে এলেন তাদের দেখতে। কিন্তু এখানে এসেই তিনি মারা গেলেন। তখন খাসি রীতি অনুযায়ী সবচেয়ে ছোটো মেয়ে কা-সিঙ্গাইর ওপরই পড়ল মাকে সৎকার করার দায়িত্ব। তার তাপে গাছপালা, ঝোপঝাড় সব পুড়ে ছাই, নদী-ঝরনা সব শুকিয়ে গেলেও সবাই অবাক হয়ে দেখল যে মা যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন। এবার ডাক পড়ল দ্বিতীয় মেয়ে কা-উমের। তিনি এসে জল ছড়ালে বিশ্ব সংসার বন্যায় ভেসে গেল। কিন্তু তাদের মা যেভাবে ছিলেন, সেভাবেই শুয়ে থাকলেন। সবার মনে হল যে, এতে ঘোর অমঙ্গল হবে। তখন ডাকা হল সবচেয়ে বড়ো বোন কা-ডিংকে। তার আগুনের প্রচণ্ড তাপে সব কিছু জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আগুন নেভার পর দেখা গেল, সেই আগুনের স্পর্শে তাদের মায়েরও সৎকার হয়ে গেছে। এবার তিন বোন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সেই আদি মাতার সৎকারের পর দেখা গেল সীমাহীন ধু-ধু একঘেয়ে প্রান্তর কোথায় মিলিয়ে গিয়ে তার পরিবর্তে একটু একটু করে জেগে উঠেছে পাহাড়, উপত্যকা, খাদ, ঝরনা, গাছপালা, সবুজ বনভূমি। এভাবেই পৃথিবী নতুন রূপ গ্রহণ করেছে।[১৮]

## উপসংহার

অঞ্জলি লাহিড়ী লোককথাকে বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়েছেন। যুগ-যুগান্তরের লোককথা আজও কতটা সজীব, আজও কতটা চিত্র-বিচিত্র, তার উজ্জ্বল নিদর্শন 'সোনার সিঁড়ির উপকথা'। আদতে এটি প্রেমোপন্যাস হলেও এর পরতে পরতে মিশে আছে মেঘালয়ের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস।

অঞ্জলি লাহিড়ীর জন্ম কলকাতায়, তবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শিলং পাহাড়ে। তাঁর মাতৃকুলের তিন প্রজন্ম খাসি পাহাড়েই বসবাস করেছেন। তিনি আইএ এবং বিএ পড়েছিলেন শিলঙে। জেলজীবনও

কাটিয়েছেন এ শহরেই। শিলঙের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। বিশেষত কলেজে পড়াকালীন ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে তিনি আরও গভীরভাবে মিশেছেন খাসিসমাজের সঙ্গে। জেনেছেন তাদের ইতিহাস। খাসি সমাজজীবনের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই গভীর চর্যাই তাঁকে সাহায্য করেছে খাসি সমাজজীবনকেন্দ্রিক এই উপন্যাস রচনায়।

সূত্র

১. অঞ্জলি লাহিড়ী, 'সোনার সিঁড়ির উপকথা', কলকাতা: দে'জ, ২০২২, পৃ. ৬৫-৬৭।

২. তদেব, পৃ. ২৮-২৯।

৩. তদেব, পৃ. ৫৬।

৪. তদেব, পৃ. ৫৮-৫৯।

৫. দ্রষ্টব্য, মানভি সিং, 'Nartiang Monoliths in Meghalaya are tallest in the world' https://timesofindia.indiatimes.com/city/shillong/nartiang-monoliths-in-meghalaya-are-tallest-in-the-world/articleshow/64837454.cms TNN / Updated: Jul 3, ২০.৮, ১৩:২০, ০৩ জুলাই, ২০২৩, সকাল ১১.০০।

৬. অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৭. তদেব, পৃ. ৬১।

৮. Mrs. Rafy, 'Folk Tales of the Khasis', London: Macmillan & Co, 1920, pp. 137-39.

৯. অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

১০. দ্রষ্টব্য, Bani Kanta Kakati, 'The Mother Goddess Kamakhya', Gauhati: The Assam Publishing Corporation, 1948.

১১. অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

১২. বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (সম্পা.), 'জনজাতীয় সাধু', কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১০, পৃ. ২৪-২৮।

১৩. অঞ্জলি লাহিড়ী, ২০২২, পৃ. ৭২-৭৩।

১৪. তদেব, পৃ. ৬৫।

১৫. তদেব, পৃ. ৬৮।

১৬. তদেব, পৃ. ১১৯-১২২।

১৭. Mrs. Rafy, op.cit., pp. 58-67.

১৮. অঞ্জলি লাহিড়ী, তদেব, পৃ. ৩১৯।

# লেখক-পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় | : | অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন। |
| সঞ্জয় চক্রবর্তী | : | কবি। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই: 'উৎসবের টেবিল', 'সঞ্জয় উদাস'। |
| জয়িতা দাস | : | সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই। |
| মধুপী পুরকায়স্থ | : | সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি। |
| গোবর্ধন অধিকারী | : | সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, চোপড়া। |
| রাহুল দে | : | গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি। |
| দীপশিখা দাস | : | সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সন্দিকৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি। |
| প্রাণজিৎ সরকার | : | গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি। |
| অশোককুমার রায় | : | গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি। |
| তপতী দত্ত | : | সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধাগোবিন্দ বরুয়া কলেজ, গুয়াহাটি। |
| প্রসূন বর্মন | : | সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি। |

অরুণ
ARUN
Vol XXII, Issue I, July 2024
Departmental Journal
Department of Bengali, Cotton University
Guwahati 781 001

মাঘোৎসব: আচার্যের অভিভাষণ
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ ৯

বাংলা কবিতা: উত্তরপূর্বের আলোয়
সঞ্জয় চক্রবর্তী ॥ ১৫

মেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা: অধিকার আদায়ের প্রারম্ভিক আখ্যান
জয়িতা দাস ॥ ৩৩

স্বর্ণকুমারী দেবীর দৃষ্টিতে নারী পরিসর
মধুপী পুরকায়স্থ ॥ ৪৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা: নাটমঞ্চে এক লেখকের জীবনদর্শনের বিবরণ
গোবর্ধন অধিকারী ॥ ৫৪

সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনিতে অপরাধ ও অপরাধী: একটি অধ্যয়ন
রাহুল দে ॥ ৬৭

বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র
দীপশিখা দাস ॥ ৮২

পুরাণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ: বাণী বসুর *অষ্টম গর্ভ*
প্রাণজিৎ সরকার ॥ ৯৭

কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ: বর্ণময় সাংবাদিকের জীবনালেখ্য
অশোককুমার রায় ॥ ১০৯

*সোনার সিঁড়ির উপকথা* : লোককথার খণ্ড চিত্র
তপতী দত্ত ॥ প্রসূন বর্মন ॥ ১১৫

লেখক-পরিচিতি ॥ ১২৪

সম্পাদক প্রসূন বর্মন

বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়

ISSN 2278-8026
42000 06200